সময়ের আহ্বান

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী জাতীয় পরিস্থিতি এবং ঐ সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিবাদ কীভাবে উত্তরোত্তর সকল পুঁজিবাদী দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হচ্ছিল, অন্যদিকে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কীভাবে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের শোধনবাদী চরিত্র ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল, এই নিবন্ধে সেগুলিকেই উন্মোচিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি আজকের পটভূমিতে স্বতঃ-প্রমাণিত সত্য রূপে প্রতিভাত।

ভারতবর্ষের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নির্যাতন এবং সাংস্কৃতিক অবদমনের (suppression) জগদ্দল পাথরের চাপে নাজেহাল আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসি শাসনের অবসান চেয়েছিল। গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল নিঃসন্দেহে জনসাধারণের সে আশাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে তাদের গভীরভাবে হতাশ করেছে। কিন্তু নির্বাচনের ফল যত বেদনাদায়কই হোক না কেন — এ নিয়ে এখন আর করার কিছুই নেই; এ সম্পর্কে হা-হুতাশ করাটা নিরর্থক। নির্বাচনে পরাজয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একথা বুঝতে হবে যে, আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। নির্বাচনের লাভ-ক্ষতি নিয়ে অর্থহীন বাদবিতণ্ডা করার চেয়েও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি নিয়ে জনসাধারণের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। আর সেই বিষয়গুলি যুক্ত রয়েছে আমাদের দেশের বর্তমান দমনমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে শোষিত মানুষের মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সাথে। আর এর জন্য প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছে, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা মাথায় রেখে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ। একমাত্র, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতেই আমরা জাতীয় পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করতে পারি, শাসকশ্রেণীর নানা ধরনের পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও স্লোগানের সত্যিকারের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি, সেগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রধান ঝোঁকগুলিকে বিচার করতে পারি, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণ করতে পারি এবং তারই পরিণতিতে আমাদের দেশের জনসাধারণকে ক্ষমতা অর্জনে নেতৃত্ব দিতে পারি।

সমাজতন্ত্র আজ একটা বিশ্বব্যবস্থা হয়ে উঠেছে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে একক ব্যতিক্রম হিসাবে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া সারা পৃথিবী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীন ছিল। এই একক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও সেই সময়ে বিশ্বপুঁজিবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাছাড়া সংকট সত্ত্বেও বিগত বিশ্বযুদ্ধের আগে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদ আগের তুলনায় অনেক দ্রুততার সাথে বিকশিত হচ্ছিল এবং চূড়ান্ত সংকটের মধ্যেও পুঁজিবাদী বাজারের একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বজায় ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন ছিল শান্তির পথে নিঃসঙ্গ পথিক। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধের অশুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ক্ষমতা সোভিয়েট ইউনিয়নের ছিল না। বরং সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ামক শক্তি হওয়ার ফলে কার্যত তারাই যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে শেষ কথা বলত। ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন এবং যেভাবে চাইত তেমন করেই যুদ্ধ বেধে যেত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ডেকে এনেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, তা হ'ল, সারা বিশ্বের সামাজিক শক্তিগুলি স্পষ্টভাবে দুটো শিবিরে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ শিবির এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরে বিভক্ত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি গড়ে তুলেছিল যুদ্ধ শিবির। আর অন্যদিকে মহান সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সাথে মিলে

আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া আর হাঙ্গেরির গণপ্রজাতন্ত্র, কোরিয়ার গণপ্রজাতন্ত্র, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আর মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া এবং চেকোস্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র — এরা মিলে সমাজতন্ত্র ও শান্তির শক্তিশালী শিবির গঠন করেছে। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুত্থান সমাজতন্ত্রকে একটিমাত্র দেশের গণ্ডি থেকে মুক্ত করেছে এবং তাকে একটা বিশ্বব্যবস্থায় পর্যবসিত করেছে। এটা নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য — যা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগ থেকে স্বতন্ত্র। এর অর্থনৈতিক ফলস্বরূপ বিশ্বজোড়া একটিমাত্র পুঁজিবাদী বাজার খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে, যার ফলে আমরা বর্তমানে পরস্পরবিরোধী দু'টি সমান্তরাল বাজার পেয়েছি — একটি পুঁজিবাদী বাজার এবং অপরটি সমাজতান্ত্রিক।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামসমূহের জয়যাত্রা

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, উপনিবেশ ও আধা- উপনিবেশগুলিতে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভূতপূর্ব বিকাশ, অগ্রগতি ও বিজয় অর্জন এবং তারই পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন। এই সকল আন্দোলনের প্রচণ্ড অভিঘাতে বিশ্বের চেহারাটা দ্রুততালে এবং মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এশিয়ার পরিস্থিতি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আফ্রিকার উপর সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসন একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে দাঁড়িয়ে টলমল করছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জনসাধারণ ক্রমাগত ব্যাপকভাবে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদের প্রধান খুঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। যুদ্ধ-পরবর্তী গত প্রায় পনের বছরে একশো কুড়ি কোটিরও বেশি মানুষ অথবা বলা যেতে পারে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশের মানুষ বাস করে, এমন প্রায় বিয়াল্লিশটি দেশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শৃঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার থেকেই ভাল করে বোঝা যাবে বর্তমান সময়ে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা কতখানি। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সার্বিক বিপর্যয় এখন আর বেশি দূরের বিষয় নয়। তা আজ আমাদের দোরগোড়ায়।

দেওয়ালের এই লিখন না পড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের উপায় নেই। তাদের কাছে খুবই পীড়াদায়ক হওয়া সত্ত্বেও তারা বুঝতে পারছে যে, যুদ্ধের আগের দিনগুলিতে যেভাবে তারা উপনিবেশ আধা-উপনিবেশগুলিতে জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে শুধুমাত্র বর্বর পশুশক্তি প্রয়োগ করে দমন করতে পারত, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তা অসম্ভব। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় সাম্রাজ্যবাদীরা জেনেছে যে, বর্বর শক্তির প্রয়োগ অতি অবশ্যই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ঘটাবে — যা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে সাম্রাজ্যবাদীদের শুধু পরাস্তই করবে না, তা এমন একটা উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি করবে যার ফলে ঔপনিবেশিক দেশগুলি থেকে তাদের যতটা অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা হচ্ছিল, তাকেও আর বজায় রাখা যাবে না। তাই আশু সুবিধাবাদী স্বার্থে পরিচালিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা আজ তাদের ঔপনিবেশিক নীতিকে পরিবর্তন করছে। উপনিবেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে তারা ক্ষমতা অর্পণ করছে এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির পূর্বতন শাসকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্য কঠোর শর্তে বেঁধে নানান রকমের সমঝোতা ও চুক্তি করছে। উপনিবেশগুলিতে সরাসরি শাসন কায়েম না করে ঔপনিবেশিক শোষণ চালানো — ঔপনিবেশিকতাবাদ আজ এই নতুন রূপ নিয়েছে, এই নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে।

বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকট

বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী বাজার থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলি বাজারের অভাবে বা সঙ্কোচনে ভুগছিল। গত বিশ্বযুদ্ধে পরস্পর মরণপণ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দু'টি জোটই প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করা, শত্রুর বাজার দখল করা, বিশ্বে আধিপত্য অর্জন করা এবং বাড়তি পুঁজি ও অতি উৎপাদনের পুঁজিবাদী সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উদগ্র বাসনা নিয়ে ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরিণতি তাদের আশা পূরণ করেনি, বরং বাজার সংকট তীব্রতর করেছে। পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার অধীনস্থ একটা বিশাল এলাকা বেরিয়ে গিয়ে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক বাজার সৃষ্টি করার ফলে পুঁজিবাদী বাজার লক্ষনীয়ভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের এই সংকোচন ছাড়াও, উপনিবেশগুলির একটা বিরাট অংশ প্রধান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়া কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে গিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার ফলে ঐসব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে বিশ্বের সম্পদ (resources) শোষণের পরিধি আরও সঙ্কুচিত হয়েছে। পূর্বতন ঔপনিবেশিক দেশগুলির সদ্যস্বাধীন বুর্জোয়ারা শুধু যে তাদের জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন করছে এবং তার ফলে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজার ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে তাই নয়, উপরন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বড় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রতিযোগী হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করছে। বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের মুখোমুখি সমান্তরালভাবে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বাজারের উদ্ভব ও অস্তিত্ব, আগেকার উপনিবেশগুলির দীর্ঘদিনের বাজার হাতছাড়া হওয়া এবং সেখানকার বুর্জোয়াদের বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগী হিসাবে দেখা দেওয়া — এইসব বিষয় একসাথে মিলে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজারকে অত্যন্ত বেশি করে সঙ্কুচিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বড় বড় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী বাজারও যদি তাদের শান্তিতে থাকার পক্ষে নিতান্তই ক্ষুদ্র প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে যুক্তিবিচারে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, বাজারের আরও বেশি করে ভাগ পাওয়ার জন্য তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় বর্তমান সংকুচিত বাজার (যা, ক্রমাগত অধিক সংখ্যায় উপনিবেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে নিশ্চিতভাবে আরও সঙ্কুচিত হবে) অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তার ফল হয়েছে এই যে, বৃহৎ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার বিরোধের তীব্রতা অপরিমেয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একথা সত্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক শক্তির আধার হিসাবে বিরাজ করছে। বিশ্বপুঁজিবাদী শোষণের সিংহভাগ এখনও পর্যন্ত তারাই ভোগ করছে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধশিবির তারই সর্বময় কর্তৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এই শিবিরের ছোট ছোট অংশীদাররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে চুপচাপ মেনে নিতে চাইছে না। ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হারানো বাজারকে ফিরে পেতে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উৎখাত করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে পরেই পশ্চিম জার্মানি এবং জাপানের যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তারা তাদের পূর্বশক্তি অনেকখানি পুনরুদ্ধার করলেও মার্কিন তাঁবেদারির হাত থেকে এখনও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। 'কমনওয়েলথ', 'ইউরোপিয়ান কমন মার্কেট' ইত্যাদি নামে যে ব্লক বা জোটগুলি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেই অবস্থান করছে, সেগুলি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যে চূড়ান্ত পরস্পরবিরোধী স্বার্থ কাজ করছে তারই নিদর্শন। এককথায়, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটকে তীব্রতর করে তুলে এমন পর্যায়ে এনে ফেলেছে যখন পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সময়ে তার বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্বের নিয়ম সম্পর্কে স্ট্যালিন উদ্ভাবিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং 'সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদ আগের চেয়ে আরও দ্রুত বিকাশলাভ করছে' বলে লেনিনের তত্ত্ব উভয়ই, বর্তমানের নতুন অর্থনৈতিক অবস্থায় তাদের কার্যকারিতা হারিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের তৃতীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অর্থনীতির সামরিকীকরণ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারছে এবং স্বাভাবিকভাবেই জ্বলন্ত সমস্যার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়াভাবে অস্ত্র উৎপাদন এবং শিল্পের সামরিকীকরণ এবং ক্রমাগত বেশি করে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে তারা তাদের বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে চাইছে। একথা সত্য যে, এ হ'ল ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরার সামিল। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত কিছু করে চলেছে সংকটকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এবং মিলিটারির প্রয়োজনীয় বস্তুর ক্রয়বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে প্রাণসঞ্চার করে সাময়িকভাবে হলেও পুঁজিবাদী বাজারে তেজিভাব বজায় রাখার জন্যে। কিন্তু পরিস্থিতিকে সহজ করার পরিবর্তে সামরিকীকরণ পুঁজিবাদী দ্বন্দ্ব ও সংকটকে ক্রমাগত আরও বাড়িয়ে তুলছে। সংকট যত বাড়ছে, অর্থনীতিতেও তত সামরিকীকরণ ঘটছে।

এইভাবে চক্রবৎ একটা অশুভ প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে এবং তার পরিণতিতে বল্গাহীনভাবে বেড়ে চলেছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন

সমাজতন্ত্র যে শুধুমাত্র একটা বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে দেখা দিয়েছে, তাই নয় — তার স্বল্প সময়ের ইতিহাসেই সমাজতন্ত্র সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির জন্ম দিয়ে এবং তার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি উৎপাদনের ক্রমাগত বিস্তার ও উন্নতি ঘটিয়ে চলেছে। ইতিহাসে এই প্রথম বাস্তবক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের সমস্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের সমন্বয় সাধনের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র মানুষের সৃজনীশক্তির অফুরন্ত উৎসের দ্বার উন্মুক্ত করেছে এবং তাকে সমাজের অপ্রতিহত অগ্রগতির উদ্দেশ্যে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে কাজে লাগিয়েছে। ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা, পারস্পরিক সাহায্য এবং বিশ্বসাম্যবাদী সমাজপ্রতিষ্ঠার সাধারণ উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে প্রতিদিন সংহত করে চলেছে। কার্যত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের জন্যই বিশ্বশান্তি রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান সম্মিলিত শক্তি যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের একত্রিত শক্তির চেয়েও শক্তিশালী। সর্বোপরি এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থেই বর্তমানে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার পক্ষে, কারণ আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে এই বিকাশ ব্যাহত হবে। তাছাড়া সমগ্র বিশ্বের আপামর জনসাধারণ আজকের দিনে সকল রকম অন্যায় যুদ্ধের বিপক্ষে, এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমস্ত উদ্যোগকে তারা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। অপরদিকে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ আরও তীব্রতর হয়েছে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ক্রমাগত শক্তি অর্জন করছে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্রতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এই সমস্ত কিছু মিলে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে বহুলাংশে হ্রাস করে দিয়েছে। এর ফলে অন্যায় যুদ্ধের শক্তির চেয়ে শান্তির শক্তি বর্তমানে অনেক বেশি। তাই সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরের নেতৃত্বে বিশ্বের শান্তিকামী জনসাধারণের পক্ষে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়া এবং অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিরত রাখা সম্ভব। মিশরে, ইঙ্গ-ফরাসি-ইজরায়েলি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এরই জ্বলন্ত উদাহরণ।[১] এইসব অনুকূল পরিস্থিতির ফলে বর্তমান বিশ্বশান্তি বজায় রাখার বাস্তব সম্ভাবনা বিরাজ করছে। এটি বর্তমান যুগের আর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এইসব নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদই যে অবশ্যম্ভাবীরূপে যুদ্ধ বাধায়, লেনিনের এই তত্ত্ব অকার্যকরী হয়ে পড়েছে বলে সিদ্ধান্ত করলে তা ভুল হবে। কারণ যদিও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আগেকার মত এখন সর্বব্যাপক বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে অবস্থান করছে না এবং তা আগের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবুও একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ আপন নিয়মেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে বা তা আঘাত করার অথবা যুদ্ধ শুরু করার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদ যে বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে বিরাজ করছে, তাই নয় — সে তার সমস্ত ক্ষমতা নিয়েই বহাল রয়েছে। সমস্ত দিক থেকে চাপের মধ্যে পড়ে এবং ক্রমবর্ধমান সংকটে জর্জরিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত বেশি বেশি করে সামরিক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। এবং যত অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটছে — সাম্রাজ্যবাদ ততই উগ্র মূর্তি ধারণ করে হঠকারী কাজকর্ম করার দিকে এগোচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থে সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক অর্থনীতির ধারকবাহক হয়ে উঠছে এবং তা এখন বিশ্বপ্রতিক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধবাহিনীর দুর্গ বা আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বহু দেশকে ন্যাটো, সেন্টো, সিয়াটোর মত আক্রমণাত্মক জোটে টেনে এনেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে শত শত সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। আণবিক ও গণবিধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মজুত করেছে এবং মুহূর্তের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। বিশ্বজনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা পশ্চিম জার্মানিতে জার্মান প্রতিশোধস্পৃহা ও জাপানে জাপানি মিলিটারি শক্তির পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। বাস্তব সত্য হচ্ছে —

সাম্রাজ্যবাদীরা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজ নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করে রেখেছে। এবং এটাই নতুন বিশ্বযুদ্ধের বিপদকে কঠোর বাস্তব করে তুলেছে। ইতিহাস বিচার করে দেখলেও বলতে হবে যে, আজও পৃথিবী নানা ধরনের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে, হতে পারে সেগুলি স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীরা কি লাওস এবং পশ্চিম ইরিয়ানে[২] এখনও তাদের আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে না?

তবে বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধ যে আজ মৃত্যুর মত অবধারিত নয় — একথার উপর জোর দেওয়া একটা বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব অকার্যকরী হয়ে গিয়েছে, একথা বলা সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে যে বাস্তব প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে, তারই প্রতিফলন হিসাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়ম বা পলিটিক্যাল ইকনমির নিয়ম যাই হোক না কেন — বিজ্ঞানের সকল নিয়মকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ স্বীকার করে। "মানুষ এই নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করতে পারে, জানতে পারে, পর্যালোচনা করতে পারে, তার কাজে-কর্মে সেই নিয়মগুলিকে স্বীকৃতি দিতে পারে এবং তাকে সমাজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তাকে পরিবর্তন বা নির্মূল করে দিতে পারে না। এমনকী, সে বিজ্ঞানের কোনও নতুন নিয়ম তৈরি বা সৃষ্টি করতে পারে না।" (স্ট্যালিন) সাম্রাজ্যবাদী যুগে যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়ম হ'ল পলিটিক্যাল ইকনমির এমন একটি নিয়ম — যা যুগের বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই অবস্থাগুলি হ'ল মূলত বিভিন্ন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে বাজার নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি। যতদিন এই অবস্থা বিরাজ করবে, ততদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়মও বজায় থাকবে। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তে যখন নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, একমাত্র তখনই সেই নতুন অর্থনৈতিক নিয়মের কারণে যুদ্ধের অনিবার্যতার তত্ত্ব তার কার্যকারিতা হারাবে। কিছু কিছু মানুষ যুক্তি তোলেন যে, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধশিবির ও সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরের দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চেয়ে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে এবং যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলিকে তার প্রভাবের অধীনে এনে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে দুর্বল করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে, সেহেতু পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ আর হবে না এবং সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতার তত্ত্ব আজ আর কার্যকরী নয়। তত্ত্বগত দিক থেকে একথা অবশ্য সত্য যে, দু'টি শিবিরের দ্বন্দ্বই প্রধান দ্বন্দ্ব, যা মুখ্যত বিশ্বের ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতিকে এখন নির্ধারণ করছে। সাথে সাথে এটাও সত্য যে, বাহ্যত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সবকিছুই যেন ভালোভাবে চলছে বলে মনে হয়, কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণ যেমন দু'টি শিবিরের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিহিত নেই, তেমনি পুঁজিবাদী দেশগুলির 'অবস্থা ভালো চলছে' — এটাও বাস্তবের প্রতিফলন নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যে খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে। যুদ্ধের আসল কারণ নিহিত রয়েছে ঠিক এই জায়গায়, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার এই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের মধ্যে এবং তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধশিবির ও সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরের দ্বন্দ্বের চেয়ে বাস্তবিকক্ষেত্রে আরও জোরালো হয়ে উঠছে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বহু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের যুগে যে যে অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে লেনিন পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়মকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, তা এখনও বজায় রয়েছে। সেই নিয়ম এখনও তাই অকার্যকরী হয়ে যায়নি। ফলে যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়ম কার্যকরী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধের বিপদও থাকবে। এই যুদ্ধ বর্তমানে পশ্চিম ইরিয়ানে ঘটে চলা হল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মত দু'টি পুঁজিবাদী দেশের একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে পারে, আবার এই ধরনের যুদ্ধ একটি পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের মিলিত শক্তির যুদ্ধ হতে পারে যার উদাহরণ হ'ল মিশরের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসি-ইজরায়েলি জোটের যুদ্ধ। এমনকী দুটো শিবিরে অবস্থানকারী দেশগুলির মধ্যেও যুদ্ধ হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তারই উদাহরণ। এগুলি কোথাও গৃহযুদ্ধের রূপ পাচ্ছে। আবার কোথাও তা রূপ পাচ্ছে সিয়াটো শক্তির সমর্থনপুষ্ট শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লাওসে বর্তমানে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সেই ধরনের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, পরিবর্তন যাই ঘটুক বর্তমান সময়েও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেকার যুদ্ধ বিরল ঘটনা নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়ম অনুসারেই

এই সকল যুদ্ধ ঘটছে। স্থানীয় ক্ষেত্রে হলেও এই যুদ্ধ গুলি এমনকী বিশ্বযুদ্ধের রূপ পেতে পারে। এবং শুরুতে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী দেশগুলোকে জড়িত করে যদি একবার বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন তা শুধু পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সেই যুদ্ধের দু'টি শিবিরের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক শ্রেণীযুদ্ধে পরিণত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা থাকবে। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে পরিহার করা যাবে তখনই, যখন সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করা যাবে, যখন বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবে, অথবা অন্তত আজকের দিনের পুঁজিবাদী বেষ্টনীর পরিবর্তে সমাজতন্ত্রের বেষ্টনী গড়ে উঠবে। অর্থাৎ এককথায় যখন সমাজতন্ত্র নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করবে এবং তার পরিণতিতে যুদ্ধ এবং শান্তির প্রশ্নে সমাজতন্ত্রই শেষ কথা বলবে।

এইভাবে বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শান্তি রক্ষা করার সম্ভাবনা এবং যুদ্ধ লেগে যাওয়ার বিপদ — উভয়েই সমানভাবে বাস্তব। এর মধ্যে কোনও একটার উপর অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে অন্যটিকে লঘু করে দেখলে তা হবে ক্ষমাহীন ত্রুটি। দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারসাম্যের অভাব ঘটলেই তা বাস্তবতা বর্জিত তত্ত্বাগীশতা অথবা শোধনবাদের দিকে নিয়ে যাবে। এবং উভয়ই শ্রমিকশ্রেণীকে আদর্শগত দিক থেকে শক্তিহীন করে তুলবে।

শান্তি আন্দোলন

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান সময়ের শান্তি আন্দোলন একটা নতুন ধরনের গণআন্দোলন — যুদ্ধ-পূর্ববর্তী দিনগুলিতে যার কোন নজির ছিল না। সেই গণআন্দোলনের মাধ্যমে আর একটা বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণের ঘৃণা ও বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের আকুল আকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবেই প্রকাশ পেয়েছে এবং এই কারণে দিনে দিনে তাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য এবং সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী? স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যে সহজভাবে স্ট্যালিন তাঁর 'ইকনমিক প্রবলেমস্ অফ সোস্যালিজম্ ইন দি ইউ এস এস আর' গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি এত যথাযথ ও স্পষ্ট যে, তার থেকে বেশ খানিকটা অংশ উদ্ধৃত না করে আমরা পারছি না।

"বর্তমান সময়ের শান্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হ'ল শান্তিরক্ষা করা এবং অপর আর একটি বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিহত করার সংগ্রামে ব্যাপক জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। ফলে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয় — শান্তিরক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্যপূরণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার প্রশ্নে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের শান্তি আন্দোলনের থেকে বর্তমান দিনের শান্তি আন্দোলন স্বতন্ত্র ধরনের। কারণ অতীতের ঐ গৃহযুদ্ধ গুলো আর কয়েকধাপ এগিয়ে সমাজতন্ত্রের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের কাজ করেছিল। একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সন্ধিক্ষণে শান্তির জন্য সংগ্রাম কোথাও কোথাও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে উন্নীত হতে পারে। কিন্তু তখন তা আর আজকের শান্তি আন্দোলন থাকবে না, তখন তা পুঁজিবাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে পরিণত হবে। বাস্তবে যা ঘটবে তা হ'ল, আজকের শান্তি আন্দোলন, শান্তিকে রক্ষা করার আন্দোলন হিসাবে যদি সফল হয়, তার দ্বারা একটা **বিশেষ যুদ্ধকে** ঠেকানো যাবে, সাময়িকভাবে তা স্থগিত হবে, সাময়িকভাবে একটা **বিশেষ ক্ষেত্রে** শান্তি রক্ষিত হবে, মারমুখো একটা সরকার পদত্যাগ করবে এবং তার জায়গায় সাময়িকভাবে শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আরও একটা সরকার আসবে। অবশ্যই তা এক শুভ পরিণতির লক্ষণ, যথেষ্টই শুভ। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সাধারণভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের অনিবার্যতাকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না। যথেষ্ট হবে না আরও এই কারণে যে, শান্তি আন্দোলনের সমস্ত সাফল্যের পরও সাম্রাজ্যবাদ যেমনটা আছে তেমনটাই বহাল থাকবে, ক্ষমতাসীন হয়েই থাকবে এবং তার পরিণতিতে যুদ্ধের অনিবার্যতার নিয়মও একইভাবে কার্যকরী ও বহাল থাকবে। যুদ্ধের এই অনিবার্যতাকে প্রতিহত করতে হ'লে সাম্রাজ্যবাদকেই নির্মূল করা প্রয়োজন।" তবে এই সীমাবদ্ধতা থাকলেও বর্তমান শান্তি আন্দোলনের একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য রয়েছে। যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় বিপ্লবী প্রয়োজনবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। আর এই জায়গাতেই নিহিত রয়েছে শান্তি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারণা এবং ন্যায়-অন্যায় ধারণা বর্জিত যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা থেকে উদ্ভূত শান্তিমোহের মধ্যে পার্থক্য। একজন বিপ্লবীর কাছে শুধুমাত্র শান্তির জন্যই শান্তি নয় — তার কাছে শান্তি হ'ল জীবনের সবচেয়ে মঙ্গলজনক বা সুন্দরতম বিষয়। সেই কারণে একজন বিপ্লবী সব

ধরনের যুদ্ধের বিরোধী নয় এবং যে কোন ধরনের শান্তির পক্ষে নয়। সে অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কিন্তু ন্যায়ের জন্য অর্থাৎ শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে জনসাধারণের মুক্তির যুদ্ধকে সে সমর্থন করে। তেমনি সে ন্যায়-অন্যায় ধারণা বর্জিত যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা থেকে উদ্ভূত অলীক শান্তিবাদের বিপক্ষে, কিন্তু যে শান্তি বিপ্লবকে সাহায্য করে তাকে সে সর্বতোভাবে সমর্থন করে। বস্তুতপক্ষে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে এবং পরিচালনা করতে পারলে বর্তমান সময়ের শান্তি আন্দোলনের গভীর বৈপ্লবিক তাৎপর্য রয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য অংশের শোষিত জনসাধারণকে শুধুমাত্র তাদের দেশের শাসক পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়নি; বিপ্লবের সফলতাকে সংহত করতে গিয়ে যে সমস্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীরা হস্তক্ষেপ করছিল, তাদেরও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। চীনের শ্রমিক-কৃষককেও শুধু চিয়াং-এর শাসনকে উৎখাত করতে হয়েছে তাই নয়, চিয়াংচক্রের মদতদাতা মার্কিন সামরিক শক্তিকেও উৎখাত করতে হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আজ দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন, যেগুলি সেই সব দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়, তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের নাক গলানো থেকে বিরত রাখা সম্ভব। এর ফলে যে কোন পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য অংশের শোষিত জনগণের কাছে বিপ্লবের মাধ্যমে সে দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা সহজ হয়ে উঠছে। আজকের দিনে শান্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য নির্দিষ্টভাবে নিহিত রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে, তা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ফলে কী উন্নত, কী নির্ভরশীল সকল দেশে বিপ্লবী শক্তিসমূহের পক্ষে কোন ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলন বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি কোন রাজনৈতিক কৌশলও নয় অথবা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কালক্ষেপ করার চতুর কৌশলও নয়। বরং উল্টো দিকে এই দুই নীতির প্রত্যেকটিই হ'ল উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জটিল বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অন্যতম। এইভাবে যুদ্ধবাজ শক্তির উপর শান্তি রক্ষাকারী শক্তির প্রাধান্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চেয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব থাকবার ফলে পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামের দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের ও বিকশিত হওয়ার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হ'ল, এই ধরনের অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বৈপ্লবিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিতান্ত সামান্য অগ্রগতিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। পূর্বতন উপনিবেশগুলির সদ্যস্বাধীন দেশের জনসাধারণের আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে খুঁটিয়ে দেখলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এই সমস্ত দেশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আদর্শগতভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। এর অন্যতম কারণ হ'ল, এশিয়া-আফ্রিকার এই দেশগুলির শাসক বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা এবং তাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে — একমাত্র সেগুলিকেই ঘটা করে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু সদ্যস্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলির অনির্ভরযোগ্য শান্তিনীতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুদৃঢ় শান্তিনীতির মৌলিক পার্থক্যকে দেখানোর কোন প্রচেষ্টাই নেওয়া হয়নি। এই সমস্ত দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং প্রশাসন যন্ত্রে ফ্যাসিবাদের যে প্রবণতা বেড়ে চলেছে তার দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এবং এই দেশগুলির বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী ঝোঁকের ক্রমাগত বৃদ্ধির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার কোন প্রচেষ্টাই নেওয়া হয়নি। সত্যিকারের কোনও মার্কসবাদী একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন পূর্বতন উপনিবেশগুলির শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী এজন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শান্তিপ্রিয় নয় যে তারা তাদের দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের স্বার্থে চরিত্রগতভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শান্তিপ্রিয়। বরং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থ, এবং এই মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা যে তাদের দ্রুত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা এবং সেই লক্ষ্য পূরণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে উঠতে পারে, এই বোধই তাদেরকে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শান্তিপ্রিয় করে তুলেছে। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ সমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রেও খুব কম ভূমিকা পালন করছে না। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে উপনিবেশ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদি এশিয়া-আফ্রিকার পূর্বতন উপনিবেশগুলির সদ্যস্বাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণী একথা ভুলে যায় এবং জাতীয় মুক্তি

আন্দোলনগুলিকে তার সঠিক পরিণতিতে পরিচালিত করতে অর্থাৎ সর্বহারা বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় ও এই দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যদি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের দুর্বলতা এবং ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে তাদের অবস্থানকে সংহত করতে সমর্থ হয়, তাহলে এরাই একটা সময়ে এসে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সমাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে এশিয়া-আফ্রিকায় তাদের অভিযানে কার্যত সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে উঠবে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি কমিউনিস্টদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে ঠিক হবে না।

প্রবল অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ

পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্বের অনুপস্থিতি এবং ঘরে-বাইরে ক্রমবর্ধমান বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়ার ফলে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলি দেখছে যে, পুঁজির সর্বাত্মক কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে তার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছাড়া তাদের সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। ফলে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটে চলেছে অভূতপূর্ব হারে, একচেটিয়া পুঁজির রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ একাকার হয়ে যাচ্ছে। আর এই সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে ফ্যাসিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি।

মনে রাখা দরকার, শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির সমস্যার থেকে সদ্যস্বাধীন পূর্বতন উপবেনিবেশগুলির মত পুঁজিবাদী অর্থে পিছিয়ে পড়া দেশের সমস্যা পৃথক ধরনের। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি বাড়তি পুঁজি ও অতি উৎপাদনের যে সংকটে ভুগছে, পিছিয়ে পড়া বা অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের সমস্যা তা নয়। তাদের আশু সমস্যা হচ্ছে তারা কীভাবে শিল্পের বিকাশ ঘটাবে এবং সবচেয়ে কম সময়ে কীভাবে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গড়ে উঠবে। সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে এবং পুঁজির দ্রুত কেন্দ্রীকরণ ও পুঁজিবাদী পথে উন্নত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ ঘটে চলেছে এমন এক পরিবেশে এবং যা নিশ্চিতভাবেই পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে, তার ফলে আগের মত অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতার (laissez-faire) পথে পুঁজিবাদী অর্থে পিছিয়ে-পড়া এবং অনুন্নত দেশগুলির শিল্পের বিকাশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় এই পশ্চাৎপদ দেশগুলি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একশো বছরেরও বেশি পিছিয়ে আছে। শিল্পের দুনিয়ায় দেরিতে আত্মপ্রকাশ করার ফলে এই যে পশ্চাৎপদতা ও ঘাটতি এইসব দেশে দেখা দিয়েছে, এরা তা অতিক্রম করতে পারত যদি তারা তাদের নিজ নিজ দেশের জিনিসপত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদার ভিত্তিতেই তাদের শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারত। কিন্তু সে পথ বন্ধ যেহেতু জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা অকল্পনীয়ভাবে কম হওয়ার ফলে এই সমস্ত পশ্চাৎপদ দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বাজার চূড়ান্ত সঙ্কুচিত। তাই শিল্প বিকাশ বা শিল্পায়নের জন্য এই সমস্ত দেশের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে একটিই বিকল্প পথ খোলা, তা হ'ল বাইরের বাজার দখল করা। কিন্তু বাইরের বাজার কমবেশি শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির কুক্ষিগত এবং যতদিন না তাদের হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে, ততদিন বিদেশের বাজার দখল করার সামান্যতম সুযোগও তাদের নেই। তার জন্য প্রয়োজন প্রধানত তীব্র প্রতিযোগিতায় নামার শক্তি। এই শক্তি অর্জনের স্তরে পৌঁছানো তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, যতক্ষণ না তারা এক শতাব্দী পিছিয়ে থাকা এবং সেই কারণে শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতাকে দ্রুত অতিক্রম করতে পারছে। যত চেষ্টাই করুক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিপতিদের কারুর একার পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং তাই অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেমন দেখা যায় সেই একইরকমভাবে ব্যক্তিপুঁজির কেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিকাশ ও এই দুইয়ের সংমিশ্রণে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির জন্ম এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের মধ্যেকার পারস্পরিক প্রতিযোগিতাকে একেবারে ন্যূনতম জায়গায় নামিয়ে আনা প্রভৃতি প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও কাজ করে চলেছে, যদিও কিছুটা ভিন্ন উদ্দেশ্যে। শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলি অতি উৎপাদন, বাড়তি পুঁজি এবং বাজারের সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সামরিক অর্থনীতি ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণের পথ গ্রহণ করেছে। অপরদিকে পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলিও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও পরিকল্পনার পথ নিয়েছে, যাতে করে তারা দ্রুত শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে

শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলতে পারে, এবং বিদেশের বাজারে তারা শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবে দেখা দিতে পারে। কিন্তু এসব যাই হোক না কেন উন্নত ও অনুন্নত উভয় পুঁজিবাদী দেশই তার দ্বারা ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করছে।

ফ্যাসিবাদের পরিচিতিজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য

ফ্যাসিবাদ হ'ল প্রতিবিপ্লবের একটি ইতিহাস-নির্ধারিত রূপ, যার মধ্য দিয়ে আগাম পদক্ষেপের দ্বারা পুঁজিবাদ বিপ্লবকে প্রতিহত করতে চায়। এর উদ্দেশ্য হল, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মুখে পড়ে সংকটে জর্জরিত ও বিশৃঙ্খলতায় কলঙ্কিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। পরিস্থিতির এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে — যখন প্রচলিত স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনযন্ত্র পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকটকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে যায়, যখন বাজারের কোনরকম স্থায়িত্ব রক্ষা করা ও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, যখন সংকটের ফলে জীবনে অনিশ্চয়তার কঠিন আঘাতে জনসাধারণ বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে — তখন এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মৌলিক নিয়মকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে বজায় রাখার জন্য, সংসদীয় গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বকে আড়াল করার যাবতীয় প্রকরণকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই সব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ফ্যাসিবাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, সেগুলিই তাকে চিনে নিতে সাহায্য করে। সেগুলি হ'ল প্রধানত অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত করা এবং প্রশাসনে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক দৃঢ়তা *(rigid firmness)*; এইগুলি বেশি বেশি করে রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থের একাত্মতা গড়ে তোলে এবং সংস্কৃতির যন্ত্রীকরণ *(cultural regimentation)* সৃষ্টি করে। এই অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা, প্রশাসনিক কঠোরতা, সংস্কৃতির যন্ত্রীকরণ এবং রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থের একাত্মতার চেহারা সব দেশে এক নয়। এটা নির্ভর করে প্রতিটি দেশে তার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উপর, স্বাভাবিকভাবেই যা দেশে দেশে ভিন্ন।

এমনকী, বাহ্যিক রূপের ক্ষেত্রেও ফ্যাসিবাদের বাঁধাধরা কোন প্যাটার্ন বা ধাঁচা নেই। বিভিন্ন দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কোথাও সে ব্যক্তি একনায়কত্বের রূপ নিয়েছে, কোথাও মিলিটারি শক্তির স্বৈরাচারী শাসনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার অন্য কোন কোন দেশে সংসদকে টিকিয়ে রেখে, সাথে সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের সাহায্যে তার ক্ষমতাকে সীমিত করে, ফ্যাসিবাদ একটা গণতান্ত্রিক মুখোশ ধারণ করে। দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থার সরকার গড়ার মাধ্যমে 'গণতান্ত্রিক' রূপে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটানো নিশ্চিতভাবে যুদ্ধ পরবর্তী একটি সামাজিক ঘটনা — ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। আপাতদৃষ্টিতে এর গণতান্ত্রিক আবরণ থাকায় একই সাথে এটি চরম প্রতারণাপূর্ণ। এবং বাস্তবে এটা বহু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যাঁরা ফ্যাসিবাদকে, পূর্বের অনুচ্ছেদে আলোচিত তার মূল চরিত্র বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার না করে এর বাহ্যিক রূপ দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেন — তাঁদেরকে প্রতারিত বা বিভ্রান্ত করেছে।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে পুরনো ধারণা

ফ্যাসিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত করা, প্রশাসনে কঠোর দৃঢ়তা, সংস্কৃতির যন্ত্রীকরণ এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের একাত্মতা — এগুলি নিঃসন্দেহে বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে কমবেশি মাত্রায় ফুটে উঠছে — এশিয়া বা আফ্রিকার পিছিয়ে পড়া দেশগুলিও এর বাইরে নয়। যুগের এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এযাবৎকাল প্রচলিত ধারণাকে পরিবর্তন করার দাবি রাখছে। যুদ্ধ-পূর্ব দিনগুলিতে ইটালি ও জার্মানির মত দু'টি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, যাদের বাস্তবে কোন উপনিবেশ ছিল না, সেখানে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, একমাত্র শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদের জন্ম ও বিকাশ ঘটতে পারে। মনে করা হত এই ধরনের অত্যন্ত উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতি যখন বাজারের নিদারুণ অভাবে ভুগতে থাকে, এবং প্রবল সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে, তখনই সেখানে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়

উপাদান সৃষ্টি হয়। কিন্তু ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অতীতের তত্ত্বগত ধারণা যে ভ্রান্ত তা আজ প্রমাণিত হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকায় অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল কিছু পুঁজিবাদী দেশে ফ্যাসিবাদের যে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা দিচ্ছে এবং এই ধরনের আর কিছু দেশে যেভাবে সামরিক ও ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে।

ফ্যাসিবাদ, জনগণ ও গণআন্দোলন

আগেই বলা হয়েছে যে, ফ্যাসিবাদ হ'ল পুঁজিপতিশ্রেণীর নগ্ন একনায়কত্ব। এই সংজ্ঞা থেকে কেউ কেউ ধরে নেন যে, ক্ষমতায় থাকার জন্য ফ্যাসিবাদের সামনে রয়েছে একটিই পথ এবং তা হ'ল জনগণকে নির্মমভাবে দমন করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তারপরে যখন ইটালি ও জার্মানিতে বিশ্বে সর্বপ্রথম ফ্যাসিবাদ মাথা তোলার চেষ্টা করছিল, সেই প্রাথমিক পর্বে এই ধারণাই বাস্তবে প্রচলিত ছিল। ফ্যাসিস্টদের তখন রক্তপিপাসু, শিকারি কুকুরের মত দেখানো হত, যারা জনগণকে নির্যাতন করে আনন্দ পায়। কিন্তু ঘটনা যখন অন্য জিনিস প্রমাণ করল, তখন অসচেতন জনগণ ফ্যাসিস্টদের সম্পর্কে এই চরিত্র চিত্রায়ণকে তাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের মিথ্যা আবোল-তাবোল প্রচার হিসাবে দেখল এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় ফেটে পড়ল। ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণা এবং ক্রোধের সুযোগ নিল ও কমিউনিস্টদের অস্তিত্ব নির্মূল করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এগোল।

ফ্যাসিবাদ সর্বত্র এবং সবসময় দু'মুখো নীতি নিয়ে চলে, তা হ'ল, একদিকে জনগণকে দমন করা, অন্যদিকে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বা ঠকিয়ে নিজেদের দিকে টেনে আনার নীতি। এর লক্ষ্য যতটা না জনশক্তিকে নির্মমভাবে দমন করা, তার চেয়ে বেশি হ'ল কৌশলে তাদের মন জয় করে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তৈরি করা, যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে 'জাতীয় পুনর্গঠনের' ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলিকে কার্যকরী করতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে। সহযোগী জনশক্তি পিছনে না থাকলে ফ্যাসিবাদ তার শাসন কায়েম করতে পারে না। তাই ফ্যাসিবাদ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, জনগণকে ছোটখাট অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং তা থেকে উদ্ভূত জীবনের অনিশ্চয়তা, যেমন বেকার সমস্যা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এইভাবে ফ্যাসিবাদ পুঁজিপতিদের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে এমন কী ব্যক্তিপুঁজিপতিদের উপর এবং তাদের যথেচ্ছ উৎপাদনের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সংক্ষেপে একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তথাকথিত বুর্জোয়া কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অবস্থান গ্রহণ করে। এই তথাকথিত কল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার সাথে সাথে ফ্যাসিবাদ বিপ্লবী চিন্তাকে নির্মূল করার জন্য নিরলস তীব্র আদর্শগত লড়াই চালিয়ে যায়। আর যখন অসচেতন জনতা এই পদক্ষেপগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী ও জনমুখী বলে মনে করতে থাকে এবং ফ্যাসিস্টদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলিকে কার্যকর করার জন্য সোৎসাহে সমর্থন জানায়, তখন ফ্যাসিস্টরা চিন্তাগতভাবে কমিউনিজমকে এবং শারীরিকভাবে কমিউনিস্টদের পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করার জন্য তাদের সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তার এই যুদ্ধে ফ্যাসিবাদ সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদের বিচিত্র সংমিশ্রণে তৈরি ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির জয়গান করে।

ফ্যাসিবাদ ও সংস্কৃতি

ফ্যাসিবাদ হ'ল অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এতে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে একই সঙ্গে থাকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে বিজ্ঞানের কারিগরি দিককে গ্রহণ করার কর্মসূচি এবং সমস্ত রকম অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভাববাদী ভোজবাজিকে (idealistic jugglery) শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি থেকে পরিত্রাণের সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে পরিবেশন করার চেষ্টা। এইভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি হ'ল বৈজ্ঞানিক বা সত্যনিষ্ঠ চিন্তার সাথে অলীক চিন্তার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এতে প্রকৃতি জগতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অন্যদিকে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণায় অলীক চিন্তাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে কার্য-কারণ সম্পর্ক যাচাই-এর বৈজ্ঞানিক পথ

থেকে অন্ধবিশ্বাস, পূর্বধারণা ও কুসংস্কারের চোরাপথে চালিত করা এবং তার দ্বারা শেষপর্যন্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টি করা। অবৈজ্ঞানিক, অলীক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্যাসিবাদ সমাজবিজ্ঞানের শ্রেণীসংগ্রামের নিয়মকে সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসাবে দেখতে অস্বীকার করে এবং তার পরিবর্তে শ্রেণীসংহতি ও শ্রেণীসমন্বয়ের তত্ত্বকে সৃষ্টি করে। এইভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতিতে প্রাধান্য পায় শ্রেণীবহির্ভূত অথবা শ্রেণীঊর্ধ্ব চিন্তাভাবনা।

জাতীয় উন্মাদনা সর্বদাই বুর্জোয়াদের হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র — যার দ্বারা তারা জনমানসকে শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে। ফ্যাসিস্টরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়ারা যে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ প্রচার করে, তা এবং জনসাধারণের দেশপ্রেম, এ দু'টি এক জিনিস নয়। বিষয়বস্তু ও চরিত্র, দু'দিক থেকেই এরা ভিন্ন। জনসাধারণের দেশপ্রেমের সঙ্গে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের কোন বিরোধ নেই, বরং বর্তমান যুগে কেউই প্রকৃত দেশপ্রেমী হতে পারে না, যদি না সে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। তাছাড়া যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বিশ্ব বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনমাত্র এবং মানুষের দেশপ্রেমের আবেগকে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে শোষকের হাতে হাতিয়ার, সেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত দেশপ্রেমের ধারণা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে শোষিত জনগণের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। যেখানে সমাজপ্রগতির পথে বাধা যে পুরাতন-পচাগলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থান্বেষী বুর্জোয়া উদ্দেশ্য থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হয়, সেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে বলীয়ান দেশপ্রেম মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার উৎস থেকে উৎসারিত হয় এবং সমাজপ্রগতির পথে সমস্ত বাধাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। অতএব ফ্যাসিবাদ মানুষের প্রকৃত দেশপ্রেমের অনুভূতিকে সহ্য করতে পারে না।

শ্রেণীসংহতি, শ্রেণীঐক্য, শ্রেণীঊর্ধ্ব জাতীয় স্বার্থের যে ধারণাকে ফ্যাসিবাদীরা প্রচার করে, সাধারণ মানুষের সামনে তাকে তারা এক বিশেষীকৃত রূপে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করে। তাই ফ্যাসিবাদ কখনও কখনও অতিমানবের ধারণার প্রচার করে, যে অতিমানব হচ্ছে জাতীয় ইচ্ছা ও স্বার্থের মূর্তরূপ। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, পুঁজিবাদ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বে যে ঈশ্বরচিন্তা ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল, আজ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার দিকেই আবার ঝুঁকছে এবং তাকে অবলম্বন করেই টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

ফ্যাসিবাদ, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া

প্রায়শই যুক্তি করা হয়ে থাকে যে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া থেকেই ফ্যাসিবাদের বিপদের উৎপত্তি। যদি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া বলতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে বোঝানো হয়, তাহলে এই সংজ্ঞায় আমরা কোন ভুল দেখি না। কিন্তু এক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, রক্ষণশীলতার অর্থেই এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্তত আমাদের দেশে কথাটি দিয়ে বর্তমানে এটাই বোঝানো হয়ে থাকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদের বিপদ দেখছে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে স্বতন্ত্র পার্টি[৩], জনসংঘ[৪] প্রভৃতি দল। এই দলগুলি রক্ষণশীল দল এবং এগুলি দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল নয়। ফলে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতে রক্ষণশীলতা থেকেই ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ। আমাদের মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন জনসমর্থনের। জনসাধারণের চিন্তাভাবনায় জায়গা করতে না পারলে এবং তাদের ভাবাবেগকে জয় করতে না পারলে জনসমর্থন লাভ করা অসম্ভব। জনগণকে নিজেদের দিকে টেনে আনার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার কোন কিছুই দেবার নেই। এটা বহুনিন্দিত শ্রেণী বা শ্রেণীর একটা অংশের অচল এক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কায়েমি স্বার্থ ও তাদের পুরনো সুবিধাভোগীদের পক্ষে খোলাখুলি নির্লজ্জ ওকালতি প্রত্যক্ষ করে লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের দ্বারা

তা ঘৃণিত। জনসাধারণের মন জয় করার জন্য এবং তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থন আদায় করবার জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের কাছে সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি ও দেশপ্রেমিক বুলি সম্বলিত তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল এক কর্মসূচি, যে কর্মসূচি সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিই মানুষের কাছে তুলে ধরে। বাস্তবিক পক্ষে রক্ষণশীলতা নয়, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির মধ্যেই ফ্যাসিবাদের বিপদের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

ইতিহাসসম্মতভাবে বলতে গেলে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ রক্ষণশীলতা কোথাও কখনও ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়নি। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিই ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং তাকে লালন-পালন করেছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির ঘরানা থেকেই ফ্যাসিবাদী দর্শনের জন্ম হয়েছে। যেমন, ইটালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের কথাই ধরা যাক। এই সমস্ত দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থে তাদের নিজেদের দেশের সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলি 'সামাজিক দেশপ্রেমের' (social patriotism) যে প্রচার করেছিল তার মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছে। ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের জন্মদাতারা, যারা সকলেই ছিলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতা, তারা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের ফেলে দেওয়া দণ্ডটিকে তুলে নিয়েছেন এবং তাদের দলীয় কর্মসূচিতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পদক্ষেপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে ইটালির কথা বলা যেতে পারে। ইটালিতে ফ্যাসিবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা মুসোলিনি ছিলেন সিন্ডিক্যালিস্ট ঝোঁকসম্পন্ন একজন অগ্রণী সমাজবাদী নেতা। তাঁর কর্মসূচিতে প্রায় সকল ধরনের সিন্ডিক্যালিজমের তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার ফ্যাসিস্ট পার্টি ছিল নামেমাত্র সমাজবাদী। প্রথম দেশটিতে এর নাম ছিল 'জাতীয় সমাজবাদী পার্টি' এবং পরের দেশটিতে তার নাম 'খ্রিস্টীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি'। এরকম উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই। আবার দেখা যায়, ফ্যাসিবাদ তার গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নির্ভর করে জাতীয়তাবাদ, শ্রেণীসমন্বয় ও সকল শ্রেণীর ঐক্যের তথাকথিত প্রয়োজনের উপর; এবং সাথে সাথে জাতীয়তাবাদী নয় এমন সমাজতন্ত্র, বিশেষ করে সাম্যবাদের প্রতি বিদ্বেষের উপর। এসব ক্ষেত্রে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির সঙ্গে ফ্যাসিবাদের প্রায় কোন পার্থক্য নেই। ফ্যাসিবাদের জন্মের আগেও সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি এইসব ধারণারই বিস্তার ঘটিয়েছিল এবং তার দ্বারা ফ্যাসিবাদেরই জমি তৈরি করেছিল। পরিশেষে বলা যায়, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির গর্ভেই ফ্যাসিবাদের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে। যুদ্ধ পূর্ব সময়ে যদি এটা সত্য হয়ে থাকে, তবে আজ তা আরও সহস্রগুণ বেশি সত্য। কারণ বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিই পুঁজিবাদের শেষ অবলম্বন। আমরা আরও দেখিয়েছি যে, বর্তমানে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দু'টি এখন পরস্পর একেবারে মিশে গিয়েছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে।

ভিত্তি ও উপরকাঠামো

ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, উন্নত বা অনুন্নত, ছোট বা বড় সকল পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এমনকী পুরনো এবং দীর্ঘদিনের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশগুলিও এর থেকে মুক্ত নয়। যে বুর্জোয়ারা সংসদীয় ব্যবস্থাকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের কাছেও এই ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? এই পরিবর্তন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার জন্য সমাজপ্রগতির এক একটি বিশেষ স্তরে সমাজের ভিত ও উপরকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্কটিকে বুঝতে হবে এবং সেই প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসকেও খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, বিকাশের যে কোন একটি স্তরে সমাজের ভিত্তি হল সেই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এ ধরনের প্রত্যেকটি ভিত্তিরই একটা উপরকাঠামো থাকে। রাজনীতি, প্রশাসন, আইন, ধর্ম, চারুকলা, দর্শন ও সংস্কৃতি — প্রতিটি ক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিষ্ঠান, বহিরাবয়ব ও রীতিনীতি-ই হল সমাজের উপরকাঠামো। এই উপরকাঠামো একটা ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে, এর কাজই হ'ল নির্দিষ্ট করে এই ভিত্তির হয়ে কাজ করা, ভিত্তি যাতে তার নির্দিষ্ট রূপে গড়ে উঠতে পারে ও সংহত হতে পারে তার জন্য তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা এবং পুরনো মরণোন্মুখ ভিত্তি ও তার উপরকাঠামো, তাদের

অবশিষ্টাংশগুলিকে নির্মূল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এখন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মূল বনিয়াদ, তা পরিচালিত হয় সর্বোচ্চ মুনাফালাভের মৌলিক নিয়মের ভিত্তিতে। পুঁজিবাদী সমাজের উপরকাঠামোটির উদ্দেশ্য তাই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের এই নিয়মকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে রূপায়িত করা। কিন্তু এই নীতিকে কার্যকরী করবার মত পরিস্থিতি সবসময় একই রকম থাকে না, ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুঁজিপতিশ্রেণীকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের নিয়মটি যাতে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে রূপায়িত হয়, তা সুনিশ্চিত করার জন্য উপরকাঠামো, তার অর্থনৈতিক সংগঠনের রূপ ও রীতিনীতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনযন্ত্র ইত্যাদিতে পরিবর্তন করতে হয়। বলাবাহুল্য, উপরকাঠামোতে যাই পরিবর্তন হোক, তার দ্বারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র পরিবর্তিত হয় না। কারণ পরিবর্তন সত্ত্বেও উপরকাঠামো তার ভিতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বজায় থাকে এবং তার সেবা করে, যা পুঁজিবাদী সমাজে সবসময় একই থাকে এবং এর সর্বোচ্চ মুনাফালাভের মূল নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

পার্লামেন্ট হল ইতিহাসসম্মত পথে গড়ে ওঠা বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাদী সমাজের বনিয়াদের উপর একটি রাজনৈতিক উপরকাঠামো। পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভবের পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না। আবার পুঁজিবাদী সমাজের বদলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার অস্তিত্ব থাকবে না। একটা নির্দিষ্ট স্তরে এর শুরু, আর এক নির্দিষ্ট স্তরে এর শেষ। আর শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী অবস্থায় এর একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্রই জানেন যে, রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের (অ্যাবসলিউটিজমের) পতনের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্ট সৃষ্টি হয়েছে। বুর্জোয়ারা, যারা তখন এই অ্যাবসলিউটিজমের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ধ্বজাধারী ছিলেন। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের জন্য সেই সময় প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ছিল শান্তি ও অবাধ প্রতিযোগিতার অবস্থা বজায় রাখা। সেই সময় পার্লামেন্ট ছিল আদর্শ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা বুর্জোয়াদের এইসব প্রয়োজন মেটাতে পারত। একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে অবাধ প্রতিযোগিতার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং শান্তির জায়গায় সামরিকতন্ত্র। পার্লামেন্ট, যা অতীতের বুর্জোয়া অর্থে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার ফোরাম, তা বর্তমান সময়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে, ধীরে ধীরে তার সময়োপযোগিতা হারাচ্ছে। ফলে বুর্জোয়াদের কাছে পার্লামেন্ট দ্রুত তার উপযোগিতা হারাচ্ছে এবং ফ্যাসিবাদ নানারূপে পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রশাসনিক যন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লব

বর্তমানে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে তার সঙ্গে সরাসরি যোগ না থাকা সত্ত্বেও আমরা এই প্রসঙ্গে অন্য আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। বহু প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতাদের ভাষণে ও লেখায় বার বার বিষয়টি উল্লেখিত হওয়ার ফলে তা একটা বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। বিষয়টি, বর্তমান পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কিছু কিছু পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। কমরেড ক্রুশ্চেভের মত হ'ল যে, বর্তমানের অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই সম্ভাবনা বাস্তব এবং প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান। স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর আস্থা রেখে এবং পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সঙ্গে আপসের নীতিকে পরিত্যাগ করতে যারা পারেন না, সেইসব সুবিধাবাদী শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রমিকশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল ও জনবিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করতে পারবে, সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, সংসদকে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার যন্ত্রের পরিবর্তে মেহনতি জনতার স্বার্থরক্ষার যন্ত্রে পরিবর্তিত করবে, সংসদের বাইরে গণসংগ্রাম গড়ে তুলবে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধকে চূর্ণ করবে এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে সৃষ্টি করবে।" তাঁর পূর্ববর্তী ভাষণগুলিতে বিশেষ করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন, "এই প্রসঙ্গে সংসদীয় উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব কি না, সে প্রশ্ন আসে। রাশিয়ান বলশেভিক, যারা প্রথম এই উত্তরণকে কার্যকর করেছিল, তাদের কাছে এমন কোন পথ খোলা ছিল না। ... তারপর থেকে বর্তমানে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, যা এই প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাকে সম্ভব করে তুলেছে। ... এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতি কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও

সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিকে তার পক্ষে সংঘবদ্ধ করে এবং পুঁজিপতি ও জমিদারদের সঙ্গে আপসের নীতি যারা প্রত্যাখ্যান করতে অক্ষম সেই সুবিধাবাদী শক্তিকে দৃঢ়তার সঙ্গে দূরে সরিয়ে দিয়ে জনস্বার্থবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করার, সংসদে সুস্থির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার এবং সংসদকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অঙ্গের *(organ)* পরিবর্তে প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করার মত অবস্থানে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী।" ফলে এটা জলের মত স্বচ্ছ যে, সি পি এস ইউ'র বর্তমান নেতারা বিশ্বাস করেন যে, এখন সংসদীয় পথে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল না করলেও তাঁরা আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আমাদের মতে, পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই তত্ত্বের মূলে রয়েছে এক বিভ্রান্তি। শান্তির সপক্ষে বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর প্রশ্নে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের তুলনামূলক দুর্বলতার সঙ্গে ক্রুশ্চেভ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি এবং একটা বিশেষ দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত মানুষের বিপ্লবী সংগ্রামকে দমন করার জন্য ঐ বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের হাতে যে ক্ষমতা রয়েছে তার সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। এঁরা এই কঠোর বাস্তবের দিকে দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, যুদ্ধের শক্তির চেয়ে শান্তির শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং শান্তির শক্তির দ্বারা অর্জিত বহু চমকপ্রদ বিজয় সত্ত্বেও বিশ্বপরিস্থিতির এমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি যার ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের শক্তিকে স্বীকৃতি দিলেও, পুঁজিপতিশ্রেণী তার নিজের নিজের দেশের বিপ্লবী সংগ্রামকে বলপ্রয়োগ করে দমন করতে ভয় পাচ্ছে। ইতিহাসে এমন একটিও ঘটনা নেই, যা আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যকে ভুল বলে প্রমাণ করতে পারে। বরং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনসাধারণের নিতান্ত সাধারণ অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি পূরণের আন্দোলনকে পর্যন্ত রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে নিষ্ঠুরভাবে ফ্যাসিবাদী পদ্ধতিতে দমন করা হচ্ছে। এমনকী গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে, যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানেও পূর্বে অর্জিত যৎসামান্য গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার জন্য কোন রকম বিবেকযন্ত্রণা ছাড়াই ধীরে ধীরে পরিষদীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাগুলিকে ছক কষে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফ্যাসিবাদ এখন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সাধারণ নিয়ম হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমনকী যে সমস্ত দেশে বিপ্লব সফল হয়েছিল আজ সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সমস্ত দেশেও প্রতিবিপ্লবকে প্ররোচিত ও সংগঠিত করার সাহস দেখাচ্ছে। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদ থেকে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনার মোহ পোষণ করা কি সঠিক? এর উত্তরে জোরের সঙ্গে বলতে হয় 'না'।

একথা সত্য যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পুঁজিবাদ থেকে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে না। ১৮৭২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের হেগ কংগ্রেসের পর মার্কস নিজে এই সম্ভাবনাকে স্বীকার করে বলেছিলেন, "আমরা জানি যে, বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান, রীতি ও ঐতিহ্যের কথা বিশেষ করে খেয়াল রাখা দরকার। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের মতো এমন দেশ আছে যেখানে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ পথে তাদের লক্ষ্য পূরণের আশা করতে পারে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বলব, হল্যান্ডও একই পর্যায়ে পড়ে।" প্রথমত মার্কস্ শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের তত্ত্বকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে তুলে ধরেননি; তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ডের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, উপরিউক্ত এই তিনটি দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে, যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরাজ করত না এবং সেই সমস্ত দেশ তাদের বিকাশের বিশেষ অবস্থার জন্য যখন সমরসজ্জা (militarism) ও আমলাতন্ত্রকে তখনও পর্যন্ত গড়ে তোলেনি, তখন সেই সময় মার্কসের সামনে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে স্বীকার করার যুক্তিসম্মত কিছু কারণ ছিল। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য মার্কসের এই চিন্তা তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। যে বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কস একথা বলেছিলেন তাকে গুরুত্ব না দিয়ে মার্কস্কে উদ্ধৃত করার অভ্যাসকে লেনিন তাঁর 'সর্বহারা বিপ্লব ও রেনিগেড কাউট্স্কি' গ্রন্থে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। লেনিন বলেছেন, " 'ইতিহাসবিদ' কাউট্স্কি এমন নির্লজ্জভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন যে তিনি এই মৌলিক ঘটনাটাই ভুলে যান যে, যে একচেটিয়া-পূর্ব পুঁজিবাদ ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল, তা তার মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই (যা ইংল্যান্ডে ও আমেরিকাতে খুবই সুস্পষ্ট

হয়ে উঠেছিল) শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতি আপেক্ষিক অর্থে ওতপ্রোত সম্বন্ধে (attachment) আবদ্ধ ছিল এবং এইভাবেই তার বিশিষ্টতা নিয়ে বিরাজ করছিল। আর সাম্রাজ্যবাদ বা একচেটিয়া পুঁজিবাদ যা বিংশ শতাব্দীতে এসেই পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে, তার অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতমভাবে ওতপ্রোত সম্বন্ধে আবদ্ধ না থেকে সামরিকতন্ত্র বা সমরসজ্জার সর্বাত্মক এবং বিশ্বব্যাপী প্রসার ঘটিয়ে বিশেষরূপে অবস্থান করছে। 'এটা দেখতে ব্যর্থ হয়ে' শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র বিপ্লব কতদূর পর্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য বা সম্ভাবনা, তা নিয়ে আলোচনা করার অর্থ হল বুর্জোয়াশ্রেণীর নিছক লেজুড়ের পর্যায়ে নেমে আসা।"

একথা সত্য যে, লেনিন-পরবর্তীকালে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ক্রুশ্চেভ পরোক্ষভাবে যার উল্লেখ করেছেন। সেই পরিবর্তনগুলি নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলি কি সাম্রাজ্যবাদকে সর্বাত্মক সমরসজ্জার (militarism) সঙ্গে তার যে ওতপ্রোত সম্বন্ধ তা থেকে তাকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে? না কি, লেনিন যে সময়ে এটা লিখেছিলেন সেই ১৯১৮ সালের তুলনায় বর্তমানে সর্বাত্মক সমরসজ্জার সঙ্গে তার ওতপ্রোত সম্বন্ধ আরও সুদৃঢ় হয়েছে? সাম্রাজ্যবাদীরা কি আগের তুলনায় শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছে? না কি শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য অংশের শোষিত জনসাধারণের দ্বারা গড়ে ওঠা বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ফ্যাসিস্ট সুলভ হয়েছে? রাষ্ট্রকাঠামোতে আমলাতন্ত্র কি শেষ হয়ে গিয়েছে, না কি আগের চেয়ে তা আরও দৃঢ়মূল হয়েছে? শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বর্তমানে কতদূর সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিরা স্বেচ্ছায় শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবে — এই চিন্তা যে কতদূর অসার এবং অবাস্তব, উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বর্তমানে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব কি না, তা বিতর্কের বিষয়। আমরা মনে করি না সেটা সম্ভব। আমাদের মতে সশস্ত্র বিপ্লবের নিয়মই এখনও পর্যন্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাধারণ নিয়ম হিসাবে অবস্থান করছে। আগেই আমরা আমাদের মতের সমর্থনে যুক্তিগুলি তুলে ধরেছি। এমনকী যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, বর্তমানে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব, তা হলেও "সংসদে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখল করে এবং সংসদকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটা যন্ত্র থেকে পরিবর্তিত করে জনসাধারণের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করা"র যে কথা ক্রুশ্চেভ বলেছেন এবং আমরা যা আগে উদ্ধৃত করেছি — সেভাবে চিন্তা করা মার্কসবাদসম্মত হবে না। একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর কাছে 'কোন একটা পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর অর্থ হ'ল, শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা যেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী কোন বাধা দেবে না এবং শান্তিপূর্ণভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা যাবে ও তাকে সরিয়ে তার জায়গায় নতুন ধরনের রাষ্ট্র অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এর অর্থ এরকম নয় যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে শান্তিপূর্ণভাবে সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যায় — তা কখনই সম্ভব নয়। শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আরও অর্থ হ'ল, শান্তিপূর্ণভাবে সংসদের বিলোপ ঘটিয়ে তার জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তাই এই অর্থেই এটা কখনই বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে সংসদ, শান্তিপূর্ণ পথে তার রূপান্তর ঘটিয়ে জনগণের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত করা নয়, এটা কখনই সম্ভবও নয়। এই সমস্ত নেতারা একটা বিষয় বুঝতে ভুল করেছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের উপরকাঠামো কখনই সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তির উপরকাঠামোর কাজ করতে পারে না। পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি, তার রাজনৈতিক উপরকাঠামো যে সংসদ, তা শুধু যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে না তাই নয়, সেই সংসদকে উচ্ছেদ করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজে, তার ভিত্তি অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠবে এক ভিন্ন ধরনের উপরকাঠামো যা ঐ ভিত্তিকে তার নিজস্ব রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে ও সংহত হতে সাহায্য করবে এবং পুরনো মরণোন্মুখ ভিত্তি ও তার উপরকাঠামোর যতটুকু অবশিষ্টাংশ রয়েছে তাকে উচ্ছেদ করার প্রয়াস চালাবে। "বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখপাত্র সংসদকে প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের ইচ্ছার যন্ত্রে রূপান্তরিত করা" যদি সম্ভব হয়, তাহলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রে, বুর্জোয়া পার্টিকে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি একইভাবে সম্ভব হবে। এভাবে ভাবা কোন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়। এ হ'ল মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের চূড়ান্ত অপব্যাখ্যা।

জাতীয় পরিস্থিতি

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমাদের জাতীয় পরিস্থিতিকে বিচার করে দেখতে হবে। ভারতবর্ষ কীভাবে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তা সকলেরই জানা। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী দিনগুলিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে প্রাধান্য উপভোগ করত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার অবসান ঘটেছিল। তার অর্থনীতি কার্যত ধ্বংসের মুখে এসে পড়ে তার নিজের দেশের জনসাধারণের উপর কঠিন আঘাত হানল। ফলে তারা অস্থির হয়ে পড়ল। উপনিবেশগুলিতেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল জোয়ার বইতে লাগল। ভারতবর্ষে দেশপ্রেমিক জনগণ পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংগ্রাম পরিচালনা করতে লাগল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহ্বান ছাড়াই জনসাধারণের নিজেদের শুরু করা এই সংগ্রাম ধীরে ধীরে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ পাচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে এই সংগ্রাম ছিল বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা এই সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল না। এ ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তার যথার্থ পরিণতি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যের সাথে অবধারিতভাবে যুক্ত। তাই যুদ্ধ-পরবর্তী পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে তাদের এমন একটা সহযোগী শক্তি খোঁজার প্রয়োজন অনুভব করল যাদের হাতে তারা নির্দ্বিধায় ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে, যাদের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে পারে এবং তার দ্বারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে পারে। ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়ারা — যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আন্দোলন ক্রমাগত তাদের হাত ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং বিপ্লবাত্মক রূপ নিচ্ছে দেখে তারাও মরণভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। তারা তাই সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আপসের মাধ্যমে মতভেদ মিটিয়ে যেমন করে হোক ক্ষমতা দখল করতে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ইতি টানতে চাইল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী উভয়েই তাদের পারস্পরিক স্বার্থে একটা সমঝোতায় এল। সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে সক্ষম হ'ল, অন্যদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হ'ল — যদিও তা, দেশকে খণ্ডিত করার বিনিময়ে।

যুদ্ধ-পরবর্তীকালে অন্যান্য যে সমস্ত দেশ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের তুলনায় ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী বিকাশ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ক্ষমতা অর্জনের পর তার একমাত্র মাথাব্যথা ছিল কীভাবে সবচেয়ে কম সময়ে সে তার তুলনামূলক ঘাটতি এবং দুর্বলতাকে অতিক্রম করবে এবং ভারতবর্ষকে একটা শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে। সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও (স্বাধীনতার ১২ বছর পরে ১৯৬০ সালে ভারতে বিদেশি ব্যক্তিগত লগ্নিপুঁজি ২৫৫.৮ কোটি টাকা থেকে ৬৫৫ কোটি টাকা পর্যন্ত উঠেছে) ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যের মুখে পড়ে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এক লহমায় সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে দাঁড়াতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, তারা এটা উপলব্ধি করেছিল যে, যদি তারা ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে পুরোপুরি গাঁটছড়া বেঁধে ফেলে, তাহলে শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে এক শতাব্দীর পশ্চাৎপদতাকে অতিক্রম করতে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলতে এবং ভারতবর্ষকে একটা শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অতি সামান্য সাহায্যই পাবে। উপরিউক্ত লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে দু'টি শিবিরের প্রত্যেকটি থেকে সর্বাধিক সাহায্য আদায় করতে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী একটা নিরপেক্ষতার ভান বজায় রেখে বর্তমান বিশ্বে সামাজিক শক্তিগুলির ভারসাম্যকে ব্যবহার করছে।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পনের বছরে ভারতবর্ষে যতটুকু সীমিত শিল্পে বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়েছে, তাই-ই ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীকে বাজার সংকটের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। বেকারিত্ব, অর্ধ-বেকারিত্ব, ক্রমাগত ট্যাক্সের বোঝাবৃদ্ধি, জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধি, প্রকৃত আয় কমে যাওয়া এবং আমূল ভূমি সংস্কার না হওয়ার কারণে ভারতীয় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছে ও তার ফলে আভ্যন্তরীণ বাজার চূড়ান্তভাবে সংকুচিত হওয়ায় ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী বাইরের, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্বতন উপনিবেশগুলির মধ্যে বাজারের সন্ধান করছে। কিন্তু সে বাজারের ক্ষেত্র তো খোলা মাঠ নয়; শক্তিশালী পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং জাপান ইতিমধ্যেই সেখানে রয়েছে। তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া

অর্থনীতির শক্তির ভিত্তিতে এককভাবে সেই সমস্ত শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশকে বিতাড়িত করে তাদের বাজার দখল করে নেওয়া ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী জানে যে, সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে উপরিউক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্মম শোষণ ও দমনপীড়নের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং তার ফলে উদ্ভূত তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা রয়েছে। শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে এই মনোভাবকে আরও তীব্রতর করা এবং শেষপর্যন্ত তাদেরকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজার থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী এই সদ্যস্বাধীন দেশগুলির জনসাধারণের সত্যিকারের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগাচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থে দুর্বল দেশগুলির উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এবং তার দ্বারা সেখানে বাজার দখলকে সহজতর করার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সক্রিয়ভাবে অ্যাফ্রো-এশিয়ান দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির একটা ব্লক তৈরি করা এবং তার নেতা হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন, বান্দুং সম্মেলন প্রভৃতি হ'ল এই ধরনের প্রচেষ্টা। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে বাজার দখলের আকাঙ্ক্ষা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করেছে। এই তিনটি বিষয় একত্রে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার পিছনে কাজ করেছে। তার শান্তির আকাঙ্ক্ষার পিছনেও একই উদ্দেশ্য সক্রিয়। এখনই বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে তা ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীকে বিশ্বের সামাজিক শক্তিসমূহের বর্তমান ভারসাম্যের সুযোগ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করবে এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার প্রচেষ্টাকে শ্লথ করে দেবে। একটা শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে দ্রুত গড়ে ওঠার স্বার্থেই ভারতের প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। এই বাস্তব প্রয়োজনই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে শান্তিকামী এবং পঞ্চশীল নীতি অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার পাঁচটি নীতির এক সমর্থকে পরিণত করেছে।

কিন্তু এ হ'ল ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রের একটা মাত্র দিক। তার আরও একটা দিক রয়েছে; দুঃখের কথা হ'ল, একে অবহেলা করা হয়েছে। প্রতিটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এবং সেই অর্থে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক সুপ্ত রয়েছে — যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যেই নিহিত। একটা বিশেষ দেশের শক্তি ও সুযোগ অনুসারে এবং সুবিধাজনক অবস্থায় এই ঝোঁকগুলি খোলাখুলি বেরিয়ে আসে ও প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ভারত সরকারের নীতিতে এই সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁক খুঁজে পাওয়া যাবে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সরকারি নীতি তার নিজের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে। অবশ্য এখনও তা প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে রূপ পায়নি। এখনও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য আপেক্ষিক অর্থে শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত থাকা। কিন্তু দ্রুত তাদের সে বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হচ্ছে এবং তার জায়গায় বৃহৎশক্তিসুলভ উগ্রতা এবং সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্থান করে নিচ্ছে। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতি ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান নরম মনোভাব — যা বেলগ্রেড সম্মেলনে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে যুগোস্লাভিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইজিপ্ট্ এবং অন্যান্য সদ্যস্বাধীন অ্যাফ্রো-এশিয়ান দেশগুলির সঙ্গে মতপার্থক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে — তা ভারত সরকারের ক্রমহ্রাসমান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকার লগ্নিপুঁজি খাটিয়ে নেপাল, সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা), বর্মা (বর্তমানে মায়ানমার) এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির জনসাধারণকে শোষণ করার দ্বারা দ্রুত একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে গড়ে উঠছে। যে দেশ টাকার পুঁজি নিয়ে শোষণের ক্ষেত্রকে বাড়ানোর অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে দেশ কখনও যথাযথভাবে ঔপনিবেশিকতাবাদকে নির্মূল করার সংগ্রাম চালাতে পারে না।

সামরিক বাহিনীর ব্যবহার্য বস্তু ক্রয়ের ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সঙ্কুচিত আভ্যন্তরীণ বাজারের সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শ্রেণীশাসনকে পাকাপোক্ত করতে হলে ও ভারতবর্ষকে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে এবং সাথে সাথে বলপ্রয়োগ করে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে দমন করতে হলে, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মিলিটারির শক্তি না বাড়িয়ে কোন উপায় নেই। কিন্তু যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দের বৃদ্ধি এবং মিলিটারি শিল্পের প্রসার — শান্তিনীতি, যার অনুসরণ জনসাধারণ কামনা করে, তার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন এবং এই কারণে

জনসাধারণের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, তাই শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী সামরিকীকরণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'জাতির বিপদ' 'বিদেশি আক্রমণের বিপদ' এই ধরনের সহজে আকর্ষণকারী স্লোগান তুলে একটি জরুরিকালীন অবস্থা জারি করার অনুকূল মানসিকতার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং বহুলাংশে সফলও হয়েছে। মিলিটারি খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করে সঙ্কুচিত আভ্যন্তরীণ বাজারের কৃত্রিম তেজিভাব বজায় রাখার এবং ভারতবর্ষের সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যত দীর্ঘ সময় সম্ভব চীনের সাথে সীমান্ত সমস্যা, পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে তার নানান বিতর্কিত বিষয়কে জিইয়ে রাখার পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক যে অর্থনীতির সংকট যত তীব্র হবে, জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে শাসকশ্রেণী তত বেশি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে হৈচৈ করবে।

ভারতীয় পুঁজির কেন্দ্রীকরণ

এটা ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যখন পুঁজিবাদী বাজারের স্থায়িত্বের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি হ'ল যুগের বৈশিষ্ট্য, তেমন একটা সময়ে পুঁজির ক্ষমতার সর্বব্যাপক কেন্দ্রীকরণ ছাড়া ভারতবর্ষের মতো তুলনামূলকভাবে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের দেশে সর্বব্যাপক এই কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া স্পষ্টত প্রতীয়মান। মহলানবীশ কমিটির[৭] মত অনুযায়ী ১৮টি ভারতীয় পরিবার ভারতবর্ষের মোট সম্পদ ও সম্পত্তির শতকরা ৭৮ শতাংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সমীক্ষার আওতাধীন ১০০১টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মধ্যে ৯টি কোম্পানির প্রত্যেকটির পুঁজি ৩০ মিলিয়ন (৩ কোটি) বা তার চেয়ে বেশি টাকার, যা কোম্পানিগুলির সবকটির মোট পুঁজির ৫৩ শতাংশ। এমনকী কংগ্রেস তাদের মুখপত্র 'ইকনমিক রিভিউ'-এর ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একথা স্বীকার করেছে যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একটা ছোট অংশ, যা পুঁজিপতিদের শতকরা ২০ ভাগের বেশি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে না, তারাই মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ আত্মসাৎ করেছে। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা যে ভারী ও বুনিয়াদি শিল্পের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক নয়, সেগুলিকে গড়ে তুলে ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার দ্বারা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যাতে তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য তাদের সমস্ত রকম সহায়তা করে যাচ্ছে। সাথে সাথে, ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিকস্বার্থে ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যক্তি পুঁজিপতিদের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলভাবে শিল্পের বিকাশ ও উৎপাদনের স্বাধীনতার উপর পরিকল্পনার মাধ্যমে বিধিনিষেধ আরোপ করছে। কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ'-এর উপর গৃহীত প্রস্তাবে এই বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি ঘোষণা করা হয়েছে, যা ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই প্রতিষ্ঠা করবে। অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে "...রাষ্ট্র বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদির মত বৃহৎ পরিষেবামূলক পরিকল্পনার উদ্যোগ নেবে এবং সেগুলিকে পরিচালনা করবে, সম্পদ, সামাজিক উদ্দেশ্য ও চাহিদার উপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ রাখবে এবং স্ট্র্যাটেজিক বা নীতিগত কর্তৃত্ব বজায় রেখে যেমন-তেমনভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষতিকারক দিকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ করবে।"

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ

ভারতবর্ষে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' একটি বারংবার উত্থাপিত স্লোগান। এর লক্ষ্যটা কী? এর উপরে উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যেই সেটা প্রস্ফুটিত। গোড়ার দিকে সি পি আই এই স্লোগানের মধ্যে বুর্জোয়াদের দ্বারা সাধারণ মানুষের সমাজতন্ত্রের জন্য দাবির স্বীকৃতি খুঁজে পেয়েছিলো। সত্যিই কী আশ্চর্য দৃষ্টিশক্তি! কারণ সে ক্ষেত্রে হিটলারের 'জাতীয় সমাজতন্ত্র'কেও শুধুমাত্র সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহারের জন্য, একই আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। পরবর্তী সময়ে তারা আগের অবস্থান সংশোধন করেছে এবং এই স্লোগানটিকে একটি ধোঁকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। সন্দেহ নেই সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গে স্লোগানটি নেহাৎ ধোঁকা। কিন্তু স্লোগানটিকে নিতান্ত সরলভাবে ধোঁকা হিসাবে ব্যাখ্যা করাটা হবে একপেশে ও ক্ষীণদৃষ্টির পরিচায়ক। প্রতিটি প্রশ্ন বিচারের দু'টি দিক আছে। কোনও বিষয়কে নির্দিষ্টভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সেটি যা নয়, তার থেকে

বিষয়টিকে কেবল মাত্র পৃথক করে ভেবে নিলেই চলবে না; শুধুমাত্র খারিজ করার দ্বারাই কোন কিছু নির্ধারণ করা যায় না। এই নঞর্থক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি, একই সাথে এই প্রক্রিয়ার সদর্থক রূপটি হ'ল, কোন বস্তু বা বিষয়কে যার থেকে আলাদা করা হচ্ছে, তার বিপরীতধর্মী বস্তু বা বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখা, তার থেকে পৃথক করা। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' সমাজতন্ত্র নয়। তাহলে এটি কী? সি পি আই এই বিষয়ে অর্থাৎ এর উত্তর স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নীরব। এই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' হ'ল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, যার দ্বারা তারা সরকারি পরিচালনায় ভারী ও মৌলিক শিল্প স্থাপন করার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করতে চায়। বিদ্যমান উৎপাদন শক্তি, তা সে যতই দুর্বল হোক, তাকে একচেটিয়া রূপ দিতে চায়, ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির মিলন ঘটাতে চায়, ব্যক্তি পুঁজিপতিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যতদূর সম্ভব নিরসন করতে চায় এবং এইভাবে দেশের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিক্ষুব্ধ জনগণ ও প্রতিযোগী বিদেশের শক্তিশালী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রূপে দাঁড় করাতে চায়। তাই এটি হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রের অবিকল প্রতিরূপ, যদিও তার থেকে অনেক দুর্বল।

এখন প্রথম যে বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার তা হ'ল, শিল্পে ভারতীয় রাষ্ট্রের মালিকানাকে সমাজতন্ত্র বলা যায় কিনা। যদি না বলা যায়, তবে তা কেন? আমরা জানি, সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে উৎপাদনের ভিত্তির উপর। পুঁজিবাদী সমাজ দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকের দ্বারা পণ্য উৎপাদনের উপর। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শিল্পের মালিক হলেই উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে যায় না, রাষ্ট্রীয় মালিকানা সত্ত্বেও যে উৎপাদন সম্পর্ক মজুরির বিনিময়ে শ্রমকে ভিত্তি করে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক থেকে যায়। একইভাবে উৎপাদনের চালিকাশক্তি যে মুনাফা অর্জন, তাও অব্যাহত থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে অন্যধরনের উৎপাদনের ভিত্তির উপর। সেখানে উৎপাদন সম্পর্ক হ'ল সামাজিক মালিকানা এবং উৎপাদনের চালিকাশক্তি হ'ল সামাজিক চাহিদা মেটানো। পুঁজিবাদী সম্পর্ক লোপ পাওয়া দূরে থাক, পুঁজিবাদী সমাজ রাষ্ট্রীয় মালিকানার দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়। এঙ্গেলস্ তাঁর 'অ্যান্টিডুরিং' বই-এ বলেছেন, "কিন্তু জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে ও ট্রাস্টে কিংবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর — এর কোনটার ফলেই উৎপাদিকা শক্তির ক্ষেত্রে যে পুঁজির চরিত্র বহাল রয়েছে তা ক্ষুণ্ণ করে না। জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলির ও ট্রাস্টের ক্ষেত্রে এটা খুবই সুস্পষ্ট। আর আধুনিক রাষ্ট্রও এমনই একমাত্র সংগঠন যাকে বুর্জোয়া সমাজ, শ্রমিক অথবা ব্যক্তি পুঁজিপতির জোর জবরদস্তিমূলক কার্যকলাপ রোধ করে পুঁজিবাদী মৌল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি সাধারণ অপরিহার্য পরিপূরক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে গড়ে তুলেছে। রূপ তার যাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র আসলে একটা পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র, পুঁজিপতিদের সার্বিক স্বার্থরক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এই রাষ্ট্র উৎপাদিকা শক্তিকে যতই করায়ত্ত করে, ততই সে আরও বেশি মাত্রায় যথার্থই পুঁজিপতিশ্রেণীর সমষ্টিগত রূপ পরিগ্রহ করে, নাগরিকদের সে ততই আরও বেশি করে শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকরা মজুরি-শ্রমিক, সর্বহারাই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিলোপ ঘটে না। বরং তা আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছায়।" কি অদ্ভুত তরতাজা রকমের পরিষ্কার। এঙ্গেলস্ এটা লিখেছিলেন ১৮৭৮ সালে। এখনও তা আরও কতখানি সত্য! তাই পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমাজতন্ত্রীকরণ নয়।

আর একটি বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে যে শিল্পায়ন করার চেষ্টা হচ্ছে, তা কি একধাপ অগ্রগতি নয় এবং সে অর্থে আমাদের দেশের জনগণের কি তাকে সমর্থন করা উচিত নয়? কিছু মানুষ এইভাবেই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।

জনগণের শিল্পায়নের দাবিকে সরকারের শিল্পায়ন নীতির প্রতি সমর্থন বলে ভুলভাবে এক করে দেখার ফলেই প্রশ্নটি এইভাবে উত্থাপিত হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি থেকেই সি পি আই উপরের প্রশ্নটির উত্তরে হ্যাঁ বলেছে, সেইমত মানুষের কাছে আবেদন করেছে। এমন কিছু না করতে বলেছে, যাতে পরিকল্পনামাফিক শিল্পায়ন কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটে। এই মনোভাবের জন্যই সি পি আই যখন কেরলে[৮] সরকারে ছিল তখন তারা শ্রমিকস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিড়লাদের[৯] সঙ্গে চুক্তি করেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আমাদের শিখিয়েছে, বস্তুকে তার পারস্পরিক সম্পর্ক (connection) ও নির্ভরতার (dependence) মধ্যেই সামগ্রিকভাবে ধরে নিয়ে (in its entirety) বিচার করতে হয়। ফলে, শিল্পায়নের এই নকশাটিকে পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এবং তাই বিচ্ছিন্নভাবে ও আলাদাভাবে এর বিচারও করা যায় না। একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে

প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ এবং সেই অর্থে শিল্পের উন্নয়নও, কোন না কোন শ্রেণীর বা শ্রেণীগুলির স্বার্থে পরিচালিত হয়। এমন কিছুই নেই, যা কোনও একটা বিশেষস্তরে সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ সমানভাবে মেটাতে পারে। তাহলে শিল্পায়নের নকশাসহ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি কার স্বার্থ পালন করতে চায়? নিশ্চিতভাবেই বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ। সে ক্ষেত্রে কী করে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে এই পরিকল্পনার স্বার্থে তাদের নিজস্ব অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রামকে পরিত্যাগ করতে বলা চলে? সকলেই জানেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প এবং যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। যদি তাদের শিল্পায়ন এবং যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ জনসমর্থন দাবি করার মত প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড হত, তাহলে তো আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করতে হত এবং ব্রিটিশ কর্তৃক শিল্প, রেলব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে জলাঞ্জলি দিতে হত। একমাত্র দালাল বুর্জোয়া (মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া) বা সাম্রাজ্যবাদের চাটুকার ছাড়া তা কেউই স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কেন? কারণ, সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শিল্পায়ন এবং যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্য এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের নিজেদের কর্তব্য খুঁজে নিতে সেদিন কোনও দেশপ্রেমিক মানুষই ভুল করেননি। সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে উৎপাদন শিল্প এবং যোগাযোগ ও যানবাহনের আধুনিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য গড়ে তোলেনি। তারা এগুলি করেছিল তাদের আরও শোষণ করার জন্য ও নিজেদের শাসনকে আরও সুসংহত করার জন্য। সেখানে এই অবস্থায় ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষের কর্তব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজেদের জীবনকে নিজেদের মতো করে গড়ে তোলা। তাই কোন দেশপ্রেমিক মানুষই শিল্পায়ন ইত্যাদির জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন করতে পারে না। আজও সেই একই অবস্থা। ভারতীয় জনগণ ক্ষমতা দখল করেনি, ক্ষমতা দখল করেছে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তার রাষ্ট্র, শিল্প উন্নয়নের এই পরিকল্পনা ভারতীয় জনগণের মুক্তির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেনি; বরং তারা তা করেছে জনগণকে আরও বেশি করে শোষণ করার জন্য এবং পুঁজিবাদী শাসনকে সুসংহত ও শক্তিশালী করার জন্য। আর সেক্ষেত্রে জনগণের কর্তব্য হ'ল বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা, নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে তোলা এবং সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া। এই পথই যথার্থ মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। ভারতীয় জনগণের এই অবশ্যকর্তব্যটি কোনরকমভাবে স্থগিত রাখা বা পরিত্যাগ করা যায় না। শিল্পায়নের প্রয়োজন মানুষের আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আরও অনেক কিছুরও প্রয়োজন আছে। প্রথমত তাদের পুঁজিবাদী শাসন থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন, যা ছাড়া তাদের জীবন ও সমাজকে তারা নিজেদের মতন করে গঠন করতেই পারবে না। মানুষকে সংগঠিত করা ও সরকারকে শিল্পায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য করা এক জিনিস, কিন্তু শিল্পবিকাশের জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগের ক্ষেত্রে ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানানো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সি পি আই এই দু'এর তফাৎ ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এইভাবে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যার সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন ঘটছে, সেই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' স্লোগানটি তুলেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করছে।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বৈতভূমিকা

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রতিফলন প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একদিকে সামান্য অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে এবং শ্রেণী সমন্বয়ের ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচারের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে নিজের পক্ষে টেনে আনার প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে জঙ্গি গণআন্দোলনের উপর বর্বর আক্রমণ নামিয়ে আনা — দমন-পীড়ন এবং নিজের মতে আনা অথবা প্রতারণা করার ফ্যাসিবাদের এই দ্বৈতনীতি ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী দক্ষতার সঙ্গে অনুসরণ করছে, যা ব্ল্যাক সার্ট অ্যাসোসিয়েশন[১০]-এর উদ্‌গাতাদের নিপুণ কৌশলের চেয়ে কম নয়। এর ফলে, আমরা দেখছি যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে — যা কি না, শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, তা সরকারি হস্তক্ষেপের দ্বারা অর্থনীতিবাদ ও আইনি-মোকদ্দমার প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করা হচ্ছে। শৃঙ্খলাবিধি রক্ষার নামে ধর্মঘট কার্যত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই শৃঙ্খলার নিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করেনি, তাদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। এমন কী যতটুকু গণতান্ত্রিক

অধিকার সংবিধানে স্থান পেয়েছিল, তাও ধীরে ধীরে 'যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ' কার্যকরী করার অজুহাতে প্রশাসনিক নির্দেশ, আইন, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতির দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। গভর্নমেন্ট সারভেন্টস্ কনডাক্ট রুলস (সরকারী কর্মীদের আচরণবিধি), প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট (নিবর্তনমূলক আটক আইন), সিকিউরিটি অ্যাক্ট (নিরাপত্তা আইন), মিটিং ও মিছিল নিয়ন্ত্রণ বিল, এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস (মেন্টেন্যান্স) অর্ডিন্যান্স (অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা পরিচালন অধ্যাদেশ) এবং এইরকম নানা দানবীয় আইনি পদক্ষেপগুলি এর উদাহরণ। এমন কী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের অধিকারকেও অস্বীকার করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের তাদের সহকর্মীদের উপরও, মায় তাদের পরিবারের সদস্যদের উপরও নজরদারি করতে বাধ্য করা হচ্ছে; এবং সরকারবিরোধী কোন কার্যকলাপ করে থাকলে এদের সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তার রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে। কবর থেকে খুঁড়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তৈরি করা প্রশাসনিক আদেশসমূহের মধ্য থেকে এই মর্মে এক বিধি খুঁজে বার করে তাকেই কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশের বর্তমান শাসকরা শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট সহ জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে নির্মমভাবে দমন করার জন্য নিয়মিত সেনাবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ও আধা সামরিক ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স নিয়োগ করতে লজ্জিত বোধ করছে না। কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়াই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার গতানুগতিক অজুহাত খাড়া করে মানুষকে ও মহিলা এমনকী শিশুদেরও নির্বিচারে এবং দলবদ্ধ ভাবে হত্যা করা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রায় দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই গত ১৫ বছরের কংগ্রেসি শাসনে ৩৫০ জনকে হত্যা করাটা জনগণের প্রতি সরকারের ফ্যাসিবাদী মনোভাবের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

জাতীয় স্বার্থে জাতীয় ঐক্যের স্লোগান

ভারতীয় বুর্জোয়ারা 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' নামক অর্থনৈতিক স্লোগানের পরিপূরক 'জাতীয় স্বার্থে জাতীয় ঐক্য'র রাজনৈতিক স্লোগান তুলে ধরেছে। এর লক্ষ্য হল, শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের অন্যান্য শোষিত অংশের সংগ্রামে তাদের আদর্শগতভাবে নিরস্ত্র করা। একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একটি জাতি অখণ্ড সত্তা নয়, তা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ভারতীয় জাতিও একটি অখণ্ড সত্তা নয়;বরং এর একদিকে রয়েছে টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, সিংহানিয়া ও অন্যান্য পুঁজিপতি, জোতদার, কুলাক, আমলাতন্ত্রের উচ্চস্তরের পদ দখল করে থাকা বড় বড় অফিসার এবং বুর্জোয়াদের অনুগত ভৃত্যরা, অন্যদিকে রয়েছে শ্রমিক, মধ্য ও গরিব চাষী, কৃষি মজুর ও অন্যান্য শোষিত অংশের মানুষ। ফলে ঐতিহাসিকভাবে আমাদের সমাজে সামাজিক শক্তিগুলি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র শ্রেণীস্বার্থে এবং তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নানান শ্রেণীতে বিভক্ত। কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, একে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এটা কমিউনিস্টদের সৃষ্টি নয়, নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইতিহাস নির্ধারিত প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। কমিউনিস্টদের 'অপরাধ' হ'ল, তারা এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে এবং সমাজ অগ্রগতির নিয়মকে উপলব্ধি করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের মতো বুর্জোয়া সমাজে সব সময় জনগণের সামনে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থকেই জাতীয় স্বার্থ হিসাবে তুলে ধরা হয়। 'জাতীয় স্বার্থের জন্য জাতীয় ঐক্য' স্লোগানটি নতুন স্লোগান নয়। সারা বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে ফ্যাসিস্টরা এই স্লোগান তুলেছে। আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী হলেও এটাই বাস্তবে সত্য যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, যারা আমাদের দেশের ফ্যাসিবাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে চায় বলে আমরা মনে করি, তারা 'জাতীয় স্বার্থের জন্য জাতীয় ঐক্যে'র স্লোগানের সাথে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণে খুবই ক্ষতিসাধন করছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি ফ্যাসিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠছে

ফলে, আমরা দেখছি যে, কংগ্রেসের 'জাতীয় পুনর্গঠনের' সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলি ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করছে। 'জাতীয় স্বার্থের জন্য জাতীয় ঐক্যে'র স্লোগানটির লক্ষ্য হল শ্রেণীসংগ্রামের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া। প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনাকে

ফেনিয়ে তোলা হচ্ছে, এবং এমনকী 'জাতীয় ঐক্য' ও 'জাতীয় স্বার্থে'র প্রতীক হিসাবে সূক্ষ্মভাবে সুপারম্যান-এর ধারণা প্রচার করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য থেকেই পণ্ডিত নেহেরুকে 'জাতীয় নেতা' এবং 'শ্রেণীউর্ধ্ব জাতীয়স্বার্থে'র মূর্তরূপ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। ফলে, ফ্যাসিবাদের সমস্ত উপাদানই মজুত রয়েছে। শুধু অভাব ছিল একটি ফ্যাসিবাদী পার্টির অস্তিত্বের। সে অভাবও অতি দ্রুত পূরণ হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় আগের চাইতে কংগ্রেস দল হিসেবে আরও বেশি ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এটাও ঠিক যে, এই দলটি এখনও ফ্যাসিস্ট পার্টির মনোলিথিক চরিত্র অর্জন করতে পারেনি। এখনও এর মধ্যে এমন ঢিলেঢালা ভাব, প্রকাশ্য গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে — যা ফ্যাসিবাদ বরদাস্ত করে না। কিন্তু এটা ফ্যাসিবাদী একটি পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ভোটারদের হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন, ভোট কেনা, অন্যের ভোট দিয়ে দেওয়া, প্রশাসনে হস্তক্ষেপ সহ এমন কিছু ছিল না যা কংগ্রেস দলের স্বার্থরক্ষার জন্য করা হয়নি এবং এগুলিই ছিল সমস্ত রাজ্যে গত সাধারণ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য। এটা আমাদের দেশে 'অবাধ ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনে'র কাল্পনিক ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে। একটি পুঁজিবাদী দেশে আপেক্ষিক অর্থে অবাধ ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের জন্য যে সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল প্রয়োজন, গত নির্বাচনের সময় আমাদের দেশে তার অনুপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। ফ্যাসিবাদের সমস্ত রকম সুপরিচিত কৌশলগুলি শাসকদল কাজে লাগিয়েছিল। উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করলেও এর বিপরীত কিছু প্রমাণ করা যাবে না। এমনকী নির্বাচনে জেতার জন্য যে পরিমাণ মিথ্যাপ্রচার এবং যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে, তার জন্য পণ্ডিত নেহেরুও নির্বাচনের শেষে তাঁর আক্ষেপ প্রকাশ না করে পারেননি। যখন তাঁর দল উপরোক্ত সমস্ত ফ্যাসিবাদী পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করছিল, তখন এই 'ভদ্র মানুষটি' কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। এমনকী তিনি সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকেও ভোটারদের কংগ্রেসের পক্ষে প্রভাবিত করতে দিয়েছেন। ঋণদান এবং ডোল দেওয়ার নামে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, বিনামূল্যে নলকূপ মঞ্জুর করা হয়েছে, নির্বিচারে লাইসেন্স ও পারমিট দেওয়া হয়েছে। একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এসব করা হয়েছে, তা হল কংগ্রেসের পক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করা। আর যখন নির্বাচন শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি একটু দুঃখপ্রকাশ করলেন! ভণ্ডামির চূড়ান্ত! তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে যা ঘটেছে, আসলে তা আগামীদিনে যা ঘটতে যাচ্ছে তার ইঙ্গিতমাত্র। যত সময় যাবে এবং পুঁজিবাদী সংকটের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পাবে, তার সাথে এর স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একক পার্টির একনায়কত্ব

সংসদীয় গণতন্ত্রের পূজারিরা দম্ভ করে যে, ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্রের চর্চা চলেছে, 'বিশ্বে তার চেয়ে বৃহত্তর গণতন্ত্র কখনও দেখা যায়নি'। একথা যদি বাদও দিই যে, এই 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' আদতে পর্দার আড়ালে ভারতীয় বুর্জোয়াদের চূড়ান্ত একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, বাস্তবিকপক্ষেও আজ আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনায়কতান্ত্রিক শাসনে বাস করছি। পার্লামেন্টে সরকারের বিরোধী কার্যকরী সর্বভারতীয় কোনও একটি দলের অনুপস্থিতি ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বাস্তবে এক দলের একনায়কত্বে নামিয়ে এনেছে। কীভাবে? সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে আইনসভায় বিরোধীদের কার্যকরী ভূমিকার উপর, বিচারব্যবস্থার আপেক্ষিক স্বাধীনতার উপর এবং জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলির সাথে কার্যপালিকার (executive) আচরণের নিরপেক্ষতার উপর। আমাদের দেশে এইসব বিষয় প্রায় অনুপস্থিত। আইনসভা — তা সে লোকসভা হোক, বা রাজ্য বিধানসভাগুলি হোক — সেখানে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আধিপত্য করছে। সরকার প্রকাশিত ১৯৬২ সালের ৭ই মার্চের প্রাথমিক(provisional) হিসাব অনুযায়ী লোকসভায় ৪৯৪টি নির্বাচিত আসনবিশিষ্ট কক্ষে কংগ্রেস দখল করেছে ৩৫৩টি আসন। রাজ্য বিধানসভাগুলির ২৯০৪টি আসনের প্রায় ১৮০০টি আসনে গত সাধারণ নির্বাচনে তারা জয়ী হয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কংগ্রেস আইনসভায় অবাধ ক্ষমতার অপব্যবহার করছে এবং বিরোধীদের দ্বারা উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলির প্রতি কোনকরম কানই দিচ্ছে না। এত দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেসের একটানা শাসন এবং ভবিষ্যতে দীর্ঘদিন অন্য কোন দলের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনার অনুপস্থিতি, ইতিমধ্যে বিচারব্যবস্থায় ও প্রশাসনের মধ্যে এই আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে যে, স্বাধীন বা দল-নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে চলাটা নিরাপদ নয়। কারণ তার দ্বারা যাদের অধীনে হয়তো

বা সারা জীবন তাদের কাজ করতে হবে, সেই শাসকদলের অসন্তোষের মনোভাবকে ডেকে আনা হবে। এর ফল হ'ল সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার সময় বিচারব্যবস্থা দু'বার ভাবছে এবং প্রশাসকরা কম-বেশি শাসক দলের অনুগত আমলায় পরিণত হয়েছে এবং সবসময় কংগ্রেস দলের 'হুজুরে হাজির' থাকছে। এটা আমাদের অযৌক্তিক অভিযোগ নয়। এটা বাস্তব সত্য; স্বৈরাচারী শাসনের লাগাম টানার মত দেশব্যাপী কার্যকরী জাতীয় বিরোধী দলবিহীন অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় ধরে একটানা কংগ্রেসি শাসনের অভিশাপ এটি। প্রতিটি সৎ মানুষ প্রতিদিন এটা অনুভব করছেন। এমনকী কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি বি চক্রবর্তীর মত মানুষরাও এই অভিযোগ প্রকাশ্যে উত্থাপন না করে পারেননি।

যদিও একটি রাজ্যে বা কিছু রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারানোর সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না, তথাপি আমাদের ধারণা, জাতীয় স্তরে দলগত অবস্থানের ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে কোনও বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই সামান্য। গ্রেট ব্রিটেন বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের থেকে ভিন্ন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ছোট উৎপাদকরা এখনও বেশ কিছুদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলবে। সেই সঙ্গে, পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলি, যারা ছোট উৎপাদকদের স্বার্থের রক্ষক, যাদের স্থানীয়, আঞ্চলিক বা রাজ্যগত স্বার্থ রয়েছে, তারা আরও কিছুদিন টিকে থাকবে এবং তা দেশজোড়া দু'টো জাতীয় বুর্জোয়া সংসদীয় দল গড়ে তোলাকে অসম্ভব করে তুলবে। যখন পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে শ্রেণীশক্তিগুলির সম্পূর্ণ মেরুকরণ এবং সংহতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে, যখন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ছোট উৎপাদন তাদের বর্তমান গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে হারিয়ে ফেলবে, এবং যখন ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী দুটো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করবে, একমাত্র তখনই দ্বিদলীয় গণতন্ত্র বাস্তব রূপ পাবে। একমাত্র তখনই কংগ্রেসের বিরোধী একটি কার্যকরী জাতীয় সংসদীয় দল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া জাতীয় স্তরে কোন দলই এই স্থান দখল করার অবস্থায় নেই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যতই ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর পরিকল্পনা, বৈদেশিক নীতি, জাতীয় সংহতির প্রচেষ্টা ও সীমান্ত বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তার উগ্র দেশাত্মবোধের পদক্ষেপকে সমর্থন করুক না কেন এবং যতই পণ্ডিত নেহেরুকে জনগণের ত্রাতা হিসাবে তুলে ধরার দ্বারা শাসকশ্রেণীর আস্থা অর্জন করে কৃপা প্রার্থনা করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'কমিউনিস্ট' নামটি বাদ না দিচ্ছে ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন না করছে — ততক্ষণ ভারতীয় বুর্জোয়াদের থেকে তাদের কাঙ্খিত সমর্থনের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বাস্তবে সংসদীয় গণতন্ত্র একক পার্টির একনায়কত্বে পর্যবসিত হচ্ছে এবং ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়ার প্রবণতা জন্ম নিচ্ছে ও দ্রুতহারে তা বাড়ছে; এমতাবস্থায় ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে খুবই হতাশাজনক।

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি — আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ারই একটি এজেন্ট

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিটি হচ্ছে একটি দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল, যার সাথে আন্তর্জাতিক সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই নেতৃত্ব বর্তমান বিশ্ব সামাজিক শক্তিবিন্যাসে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি সমাজতন্ত্রের পোশাক পরা উগ্র জাতীয়তাবাদী (social chauvinist) ও সামাজিক ফ্যাসিবাদী (social fascist) হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক কর্মসূচি গ্রহণ করায় প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির সাথে কংগ্রেসের আর মূলগত কোন পার্থক্য নেই এবং তার ফলে জনগণকে দেওয়ার মত, কংগ্রেসের পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বিকল্প কোন কিছুই তাদের নেই। শুধুমাত্র শাসক দলের সরকারি অবস্থানে থাকার ফলে কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারে কংগ্রেস যেখানে খুব উচ্চকণ্ঠ নয়, সেখানে সরকারি ক্ষমতার বাইরে থাকায় প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী। এই দলটি কমিউনিস্ট বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ভারতবর্ষে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচিতে কোন মৌলিক পার্থক্য না থাকায়, অবিরাম ধারায় প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ছেড়ে সদস্যরা কংগ্রেসে চলে যাচ্ছে। কংগ্রেস যত বেশি বেশি করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করবে, তত বেশি করে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির ভাঙন বাড়বে — তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন আমাদের এই বিশ্লেষণের সঠিকতাকেই প্রমাণ করেছে। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি

ও সোস্যালিস্ট পার্টি, যা পরে মিশে গিয়ে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেছে, তারা একসাথে লোকসভায় ২১টি এবং বিধানসভাগুলিতে ২০২টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে তা কমে গিয়ে লোকসভায় ১৯টি এবং বিধানসভাগুলিতে ১৯৫টায় দাঁড়ায়। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে সেই দলটি লোকসভায় ১২টি ও বিধানসভাগুলিতে ১৪৯টি আসন দখল করেছে। রাজ্যভিত্তিক প্রাপ্ত আসনসংখ্যা দেখাচ্ছে যে, দলটির যা কিছু শক্তি, তা বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশে সীমাবদ্ধ, যেখানে তারা গত সাধারণ নির্বাচনে ১৪৯টি বিধানসভার আসনের ১২০টিতে জয়ী হয়েছে। একটি বিপ্লবী দলের কাছে নির্বাচনে বিপর্যয়ের অর্থ কিছুই নয়, কিন্তু একটি সংসদীয় পার্টির কাছে তার অর্থ বিরাট কিছু, প্রায় মৃত্যুর সমান। প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

স্বতন্ত্র দল ও জনসংঘ — একটি রক্ষণশীল, অন্যটি হিন্দু মৌলবাদী দল

ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, পুঁজিপতিশ্রেণীর সাধারণ সামগ্রিক স্বার্থে ফ্যাসিবাদ ব্যক্তি পুঁজিপতিদের উপর এবং তাদের বল্গাহীন উৎপাদনের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণকে ব্যক্তি পুঁজিপতিরা ভালো চোখে দেখে না, এমনকী তারা ক্ষুব্ধও হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থ ও ব্যক্তি পুঁজিপতির স্বার্থের এই দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করে, যেখানে স্বতন্ত্র দল দ্বিতীয়টির প্রতিনিধিত্ব করে। এইটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় বুর্জোয়াদের রক্ষণশীল অংশের এবং ভারতবর্ষের পূর্বতন রাজ্যগুলির ভূতপূর্ব শাসকদের প্রতিনিধিত্ব করে। স্বতন্ত্র দলটি তিন বছরের কম সময় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গত সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার ১৮টি এবং বিধানসভাগুলির ১৬৪টি আসন দখল করেছে। রাজ্যভিত্তিক অবস্থা অনুযায়ী এই ১৬৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে জয়ী হয়েছে ১৪৪টিতে। অন্যদিকে জনসংঘ লোকসভায় ১৪টি এবং বিধানসভাগুলির ১১৫টি আসন দখল করেছে। বিধানসভাগুলিতে মোট ১১৫টি জেতা আসনের মধ্যে ১১২টি এসেছে মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। এর মধ্যে তিনটি রাজ্যে জনসংঘ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে উস্কে দেওয়ায় ও নির্বাচনে তাকে ব্যবহার করায় এই কিছুদিন আগেও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যথার্থ সাম্যবাদী দল নয়

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিঃসন্দেহে আইনসভায় তার অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এই দলটি লোকসভায় ১৬টি আসন ও বিধানসভাগুলির ১০৬টি আসনে জয়ী হয়েছিল। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে সেই আসন ছিল যথাক্রমে ২৭টি ও ১৬১টি। গত সাধারণ নির্বাচনে এই দলটি লোকসভায় ২৯টি ও বিধানসভায় ১৬৬টি আসন দখল করেছে। গত সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যভিত্তিক অবস্থা হ'ল, ১৬৬টি জেতা আসনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশ এই ছয়টি রাজ্য সহ কেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরা ১৫৫ জন প্রার্থীকে জিতিয়েছে। লোকসভা ও বিধানসভায় তাদের অবস্থার এই উন্নতিকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা দলের সঠিক রাজনৈতিক অবস্থান ও সাংগঠনিক শক্তির অগ্রগতির প্রমাণ হিসাবে দেখাচ্ছে। আমাদের মতে, নির্বাচনের ফলাফল থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত টানা যায় না। জনসমর্থন ও নির্বাচনে জয়লাভ আপনা থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইনের সঠিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে না, সাংগঠনিক শক্তিরও পরিমাপ করে না। নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধিত জনসমর্থন একথা প্রমাণ করে না যে, ভারতের জনগণ বেশি বেশি করে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হচ্ছে বা বিপ্লবী প্রস্তুতির অগ্রগতি ঘটছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ক্রমাগত বেশি করে কংগ্রেসবিরোধী হচ্ছে (এই কংগ্রেস বিরোধিতা বলতে সেই অর্থে সমাজতান্ত্রিক সচেতনতাকে বোঝায় না) এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী হিসাবে ভেবে কংগ্রেসকে হারানোর আশায় নির্বাচনে এই দলটির উপর ভরসা করছে। অতএব, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লাইনের পরিচায়ক নয়। বড় জোর এটা আমাদের দেশে বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংসদীয়

ঝোঁককে প্রকাশ করে। নির্বাচনে বর্ধিত জনসমর্থন দলের সঠিক রাজনৈতিক লাইনের প্রমাণ — এই দাবির অযৌক্তিকতা সহজেই বোঝা যায় যদি আমরা ইতিহাসের এই শিক্ষা ভুলে না যাই যে, এমনকী চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল দলের দ্বারা জনগণকে বিপথে পরিচালিত করা বিরল ঘটনা নয়। আমাদের দেশ অতীতে এমন অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বেশিরভাগ মুসলিম জনসাধারণ মনে-প্রাণে মুসলিম লীগকে সমর্থন করার ফলে নির্বাচনে লীগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী জয় হয়েছিল। প্রবল জনসমর্থন ও চমকপ্রদ নির্বাচনী ফলাফল হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সময় জুড়ে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল জাতীয়তাবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। সর্বশেষ অবস্থার দিকে লক্ষ করুন; জনসংঘ আইনসভায় তার অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। আমরা মনে করি, কোনও সচেতন মানুষই এর কারণ হিসাবে জনসংঘের সঠিক রাজনৈতিক লাইনের কথা বলবে না। তিনটি সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কি দেখাচ্ছে না যে, কংগ্রেসের পিছনে এখনও প্রবল জনসমর্থন রয়েছে? আমরা কি তাহলে বলব যে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাইন সঠিক এবং সমর্থনযোগ্য? আইনসভায় অবস্থার উন্নতি হওয়ার ঘটনা সঠিক রাজনৈতিক লাইনের প্রমাণ — এই যুক্তি নিতান্তই ছেলেমানুষী। কোন দলের রাজনৈতিক লাইনের সঠিকতা কখনই নির্বাচনী ফলাফল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। একইভাবে নির্বাচনে জয়ও সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির পরিচায়ক নয়। কারণ, নির্বাচনী সাফল্য নানা বিষয়ের জন্য হতে পারে, যা হয়ত সংগঠনের সঙ্গে কোন সম্পর্কযুক্ত নয়। গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু কেন্দ্রে দেখা গেছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা আপেক্ষিকভাবে পার্টির সংগঠন যেখানে দুর্বল সেই কেন্দ্রে জিতেছে, আর যেখানে তুলনামূলকভাবে সংগঠন শক্তিশালী সে এলাকায় হেরেছে।

আমাদের বিচারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সঠিক সাম্যবাদী দল নয়। এটি একটি 'কমিউনিস্ট' নামধারী পেটিবুর্জোয়া বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। একথা প্রথমেই বুঝতে হবে যে, কমিউনিস্ট নাম থাকলে, তার দ্বারাই কোন একটা পার্টি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে যায় না। টিটোর পার্টির নাম কমিউনিস্ট লীগ অফ যুগোস্লাভিয়া। কিন্তু কমিউনিস্ট নামটিই এই পার্টিকে সঠিক কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করেনি। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের দলগুলির নাম হয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট, অথবা বলশেভিক লেনিনবাদী; কিন্তু তারা কমিউনিস্ট নয়, বলশেভিক লেনিনবাদীও নয়। তারা যথার্থই ট্রট্স্কিপন্থী। একইভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে যে দলগুলি তাদের আনুগত্য দেখিয়েছে তারা নামেই ছিল সোস্যালিস্ট। কিন্তু সোস্যালিস্ট শব্দটির ব্যবহার সত্যিকারের সোস্যালিস্ট হিসাবে এই পার্টিগুলিকে প্রতিষ্ঠা করে না। একটা ভালো সংখ্যক কমিউনিস্ট পার্টি এমনকী নামেও কমিউনিস্ট নয়। তারা কেউ ইউনাইটেড লেবার পার্টি, কেউ পার্টি অফ লেবার, কেউ সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি — এইরকম। ফলে, একটা পার্টির নাম তার শ্রেণী চরিত্রের কোনরকম নিদর্শন নয়। একটি বিশেষ দল কমিউনিস্ট পার্টি কি না তা বিচার করতে হলে তার তত্ত্ব, অনুসৃত নিয়মপ্রণালী, চিন্তার প্রক্রিয়া, আন্দোলনের পদ্ধতি, সাংগঠনিক মূলনীতি এবং কার্যপ্রণালী, মার্কসবাদী যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন। কোনও কমিউনিস্ট পার্টিই এইসব মৌলিক প্রশ্নগুলি প্রসঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।

সর্বপ্রথম তত্ত্বের প্রসঙ্গ ধরা যাক। লেনিন বলেছেন, 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোনও বিপ্লবী দল থাকতে পারে না'। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের স্বীকৃতিই উদ্ধৃত করব এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করবার জন্য দলটির সদস্যদের অনুরোধ করব। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ যখন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন স্বীকার করেছিলেন যে, সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দলের সমস্ত কার্যকলাপে একটি অ-শ্রমিকশ্রেণীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপ্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। অজয় ঘোষ এই সত্যটি স্বীকার করেছেন, এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই স্বীকৃতিটি নেতিবাচক। এই স্বীকৃতি থেকে কী ইতিবাচক দিকনির্দেশ পাওয়া গেল? সদস্যদের রাজনৈতিক চেতনার মান এতই নীচু যে, কেউই অজয় ঘোষের কাছে এই প্রশ্নটি রাখলেন না। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা বরং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে দৃষ্টি দিই। মার্কসবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রতিটি ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাপদ্ধতি বা আন্দোলনের প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে কোনও না কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণকে প্রতিফলিত করে। সুতরাং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা থেকে অজয় ঘোষের নেতৃত্বের সময় পর্যন্ত সমস্ত কার্যকলাপে যদি

অ-শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপ্রক্রিয়া প্রতিফলিত হয়ে থাকে — যা এমনকী দলের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, তাহলে তা অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাপ্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করেছে। এর অর্থ হ'ল, তাদের কার্যকলাপ হয় পেটিবুর্জোয়া অথবা বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত করেছে। যে দলটি তার জন্মের সময় থেকে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পেটিবুর্জোয়া বা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপ্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত, তা কি একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে? এই প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উত্তর হল 'না'। ফলে, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি নয়' — আমাদের এই বিশ্লেষণ সেই দলের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদকের দ্বারাও প্রমাণিত হ'ল। এই দলটির ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হয় দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ, অথবা অতি বাম হঠকারিতা বা অ্যাডভেঞ্চারিজম-এর দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে — সঠিক লেনিনবাদী তত্ত্ব দ্বারা নয়। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত দলটি একটি অতি বাম অ্যাডভেঞ্চারবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণ, যারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল, তাদের থেকে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করা ও সেই জনগণের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে একটা সঙ্কীর্ণ নীতি অবলম্বন করে সংগ্রামী জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা উল্টে পরোক্ষভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধেই প্রচার চালিয়ে যেতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি, এই সঙ্কীর্ণ নীতি আমাদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির উপর আপসমুখী জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পুরোপুরি সাহায্য করেছে। জনগণ আজও সেই বিরাট ভুলের মাশুল দিয়ে চলেছেন।

এই ভুল নীতি সংশোধনের নামে এরপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পুরো উল্টোদিকে ঘুরে একেবারে বিপরীত প্রান্তে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের প্রতি ঝুঁকলো। লিখিতভাবে না হলেও বাস্তবে এই দলটি প্লেখানভ কল্পিত 'জাতীয় বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের যুক্ত নেতৃত্ব এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়া ও সর্বহারার গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' সেই বহু নিন্দিত ও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত নীতি গ্রহণ করল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারা ও কৃষক সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' লেনিনবাদী রণনীতি কার্যত পরিত্যাগ করল। এই সময়ে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে সবচেয়ে চোখে পড়ে এই দলটির দ্বারা শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ জলাঞ্জলি দেওয়ার বিষয়টি। এই দলটি তারপর জাতীয়তার প্রশ্নে এবং জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুসলিম লীগ-এর পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করল। জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও একই সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে ছেয়ে রইল। ক্ষমতা হস্তান্তরকে 'একধাপ অগ্রগতি' বলে উচ্চরবে স্বাগত জানিয়ে এবং শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারা একনায়কত্বের মৌলিক ধারণাকে লঙঘন করে দলটি 'নেহেরুর প্রতি সমস্ত রকম সমর্থন জানাও এবং জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে তোল' — এই প্রধান রাজনৈতিক স্লোগান তুলে ধরল।

পেটিবুর্জোয়া চরিত্র অনুসারেই এই দলটি তার বস্তাপচা সংস্কারবাদের উল্টো প্রতিক্রিয়ায় পুনরায় বামপন্থী হঠকারিতা বা অ্যাডভেঞ্চারবাদের দিকে ঝুঁকলো। এই অবস্থা চলল ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে দলে অবস্থা এমনই বিশৃঙ্খল ছিল যে, যখন পার্টির দলিলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি নির্ধারিত করা হয়েছিল, তখন বাস্তবে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে। রণদিভে নেতৃত্বের অস্থির দিনগুলির পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আবার দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদে গিয়ে নিমজ্জিত হ'ল। পালঘাট কংগ্রেস এতদূর পর্যন্ত গেল যে, ১৯৪৭ সালে ভারত যে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাকে 'ঝুটা' ঘোষণা করে ভারত তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত একটি উপনিবেশ বলে সিদ্ধান্ত করল। কিন্তু যখন সোভিয়েত নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে 'ভারত সরকারের স্বাধীন বিদেশনীতি'র কথা বলল, তখন তাদের কাছে সোভিয়েট নেতাদের এই বিশ্লেষণের সাথে দলের রাজনৈতিক লাইনের সমন্বয় সাধন করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের দেশ তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি উপনিবেশ। কিন্তু কীভাবে একটি উপনিবেশের 'স্বাধীন বিদেশনীতি' থাকতে পারে? সুতরাং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দিল্লি প্লেনামে পার্টির থিসিস পরিবর্তন করতে হ'ল।

তারপর থেকে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের স্রোত ক্রমাগত বয়ে চলেছে। এই স্রোত এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত কর্মকাণ্ডকে শ্রমিকশ্রেণীবিরোধী ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে। যদি যোশী নেতৃত্বকে তার অ-শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপ্রক্রিয়ার জন্য নিন্দা করা হয়ে থাকে (অবশ্যই তা ছিল তার চরিত্রের সঠিক বর্ণনা), তাহলে একই ভুলের জন্য বর্তমান নেতৃত্ব কি আরও বেশি নিন্দার্হ নয়? বর্তমান নেতৃত্ব কি যোশীর চাইতেও অনেক বেশি করে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের পূতিগন্ধময় পাঁকের গভীরে নিমজ্জিত নয়? এই দলটির বিপ্লবের রণনীতি নির্ধারণ, সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের তত্ত্বের পক্ষে ওকালতি করা, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনুসৃত অবিচল শান্তিনীতির সাথে ভারতীয় বুর্জোয়াদের 'শান্তি'নীতির পার্থক্য ও তার পেছনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা না করে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে নিঃশর্তে সমর্থন, বুর্জোয়াদের জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার বর্তমান প্রচেষ্টার সাথে সর্বহারা শ্রেণীর, জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার ধারণা এবং প্রচেষ্টার যে পার্থক্য বিদ্যমান — সে সম্পর্কে কোন কিছু না বলে এর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন, 'জাতীয় ঐক্য', 'জাতীয় স্বার্থ' ইত্যাদি স্লোগানে বুর্জোয়াদের সাথে সহমত হওয়া, সীমান্ত বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী পদক্ষেপ, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে সুসজ্জিত করে ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে শক্তিশালী করার দাবি, পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে দলের সদস্যদের দ্বারা দেশের সামরিক বাজেট বাড়ানোর জন্য আহ্বান — এগুলি হ'ল এই দলটির অ-শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতির সামান্য কয়েকটি নিদর্শন। কোন সঠিক কমিউনিস্ট পার্টিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে এ ধরনের ভুল করতে পারে না। এই ধরনের শ্রমিকশ্রেণীবিরোধী আদর্শ, চিন্তা-প্রক্রিয়া, কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ও চর্চার ভিত্তিতে যে দলের সাংগঠনিক শক্তি ও দলের কাঠামো গড়ে ওঠে, তাকে কোনভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন ও অগ্রগামী অংশের প্রতিনিধি কমিউনিস্ট পার্টি বলে চিহ্নিত করা যায় না।

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সময়ে (মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যেমনভাবে বোঝেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে কখনই তেমনভাবে সমালোচনা-আত্মসমালোচনা পরিচালিত হয়নি; সবটাই একতরফা আলোচনা করা হয় এবং ব্যক্তিকে বলির পাঁঠা করা হয়) দলের নেতারা সদস্যদের শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার কথা তুলে ধরে বলেন যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এই দলটি কখনও ভুল স্বীকার করতে ভয় পায় না। কিন্তু ভুল স্বীকার করার দ্বারাই কি প্রমাণ হয় দলটি একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি? অবশ্যই তা নয়। একটি দল দু'ধরনের ভুল করতে পারে। যেমন, (১) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক বিষয়ে ভুল রণনীতি নির্ধারণ, নিয়মনীতি, চিন্তা-প্রক্রিয়া, আন্দোলনের পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক নীতির ক্ষেত্রে ভুল; এবং (২) কৌশলগত ভুল, সঠিক তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল, দৈনন্দিন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভুল। যদি একটি দল প্রথম ধরনের ভুল, করে থাকে তাহলে তা দলটির সর্বহারা শ্রেণীবিরোধী চরিত্রকেই প্রমাণ করে। অন্যভাবে বললে, এটা প্রমাণ করে যে, এই ধরনের ভুল কোন দল করলে, নাম তার যাই হোক না কেন, সেটি একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি নয়। এবং যেহেতু এটি একটি কমিউনিস্ট পার্টি নয়, তাই তার ভুল সংশোধন করা ও তাকে শক্তিশালী করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, এক শ্রেণীর দলকে তার ভুল সংশোধনের দ্বারা অন্য আর এক শ্রেণীর দলে পরিবর্তিত করা যায় না, কমিউনিস্ট পার্টির কথা তো দূরস্থান। এই দলটির সদস্য, যারা সরল বিশ্বাসে ভুল ধারণা লালন-পালন করে এই দলটিকে কমিউনিস্ট পার্টি বলে ধরে নিয়েছে. তাদের কর্তব্য হ'ল দলটিকে ভেঙে দিয়ে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে সমস্ত সদস্য ভারতবর্ষে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাদেরকে এই পথ অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু এটি কোনভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি নয়, সেহেতু ভুল সংশোধন করে এই দলটিকে শক্তিশালী করার কথা ভাবার অর্থ হ'ল অন্যশ্রেণীর একটি দলকে শক্তিশালী করা।

তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা আপাতত এই পর্যন্তই। এখন তার প্রয়োগ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। একথা সত্য যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু একটি কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সবসময় জনগণকে সংসদীয় ব্যবস্থার অকার্যকারিতার বিষয়ে শিক্ষিত করার চেষ্টা করে এবং বিপ্লবী চেতনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংসদ বহির্ভূত গণআন্দোলন গড়ে তোলে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ ঠিক এর বিপরীত। এই দলটি শুধুমাত্র সংসদ বহির্ভূত জঙ্গি গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও বিকশিত করার চেষ্টা করে না, তাই নয়, এমন পথে তারা চলে যার দ্বারা তারা

সংসদের বাইরে জনগণের জঙ্গি আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে পারে। আমাদের দেশের জনগণের দ্বারা পরিচালিত ট্রামভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন প্রভৃতি গণআন্দোলনগুলির দিকে তাকান। প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণ ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে এসে জঙ্গি গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে এই জঙ্গি মানসিকতাকে আরও শাণিত করার ও সেগুলিকে সঠিকভাবে সংসদ বহির্ভূত আন্দোলনের দিকে পরিচালনা করার বদলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের জঙ্গি মনোভাবে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে এবং সূক্ষ্মভাবে আন্দোলনগুলিকে সংসদীয় রাজনীতির চোরাগলিতে নিয়ে গিয়েছে।

তত্ত্ব এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই মৌলিক ভুলগুলি ছাড়াও দলের কর্মপদ্ধতি এর শ্রমিকশ্রেণীবিরোধী চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপদ্ধতি, চিন্তাপ্রক্রিয়া ও আন্দোলনের প্রক্রিয়া সবসময়ই দ্বান্দ্বিক। কিন্তু বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য কোন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্কের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে, বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচি ও কোন একটি দেশে বিপ্লবের বিশেষ কর্মসূচির মধ্যে বোঝাপড়ায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আচরণ দ্বান্দ্বিক নয়, লক্ষণীয়ভাবে নিয়মতান্ত্রিক অথবা যান্ত্রিক ধরনের।

নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অন্য কোন কমিউনিস্ট পার্টির বা আরও স্পষ্টভাবে বললে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার প্রশ্নে প্রাইম মুভারের (প্রারম্ভিক চালিকাশক্তি) যান্ত্রিক ধারণা আগেও ছিল এবং এখনও তা কাজ করে চলেছে। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা পূর্বনির্ধারিতভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রশ্নাতীত ও স্থায়ী নেতৃত্ব হিসাবে মেনে নেয় না বা এই ধারণা নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং তার যে কোন সিদ্ধান্তকে অন্ধভাবে গ্রহণ করাও বোঝায় না। বরং এটা যৌথ নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করার জন্য এক মিলনাত্মক প্রকৃতির সংগ্রাম, যার পূর্বশর্ত হ'ল নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির ধারণার সাথে তার চিন্তাভাবনার ক্রিয়াপ্রক্রিয়া চালানো। কিন্তু সি পি এস ইউ এবং সি পি আই-এর মধ্যে সম্পর্ক বোঝার প্রশ্নে প্রাইম মুভারের যান্ত্রিক ধারণার ফলে সি পি আই নিজেকে পরমুখাপেক্ষীর পর্যায়ে নামিয়ে এনে ভারতবর্ষের বিপ্লবের ক্ষতিসাধন করেছে। এছাড়াও বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচি ও ভারতবর্ষের বিপ্লবের বিশেষ কর্মসূচির মধ্যে সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রেও একই যান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাপ্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বন্দ্বতত্ত্ব আমাদের সাধারণের সঙ্গে বিশেষের দ্বন্দ্বের বিচার করতে শেখায়। প্রতিটি দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট জানেন, বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচি বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের নিয়ামক নীতি নির্ধারণ করে থাকে, যা বিভিন্ন দেশের বাস্তব ও বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী সেই দেশে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হয়। একটা দেশের থেকে অন্য একটা দেশের বিশেষ অবস্থার পার্থক্য ঘটে এবং সেই কারণে বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ নিয়ামক নীতির বিশেষ ও সৃজনশীল প্রয়োগ সর্বত্র একই রকম হতে পারে না। একটা দেশ থেকে আর একটা দেশে তার পার্থক্য ঘটে। এর ফলে বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচি ও কোন বিশেষ দেশের বিপ্লবের বিশেষ কর্মসূচির মধ্যে সবসময়ই একটা দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। যিনি এই দ্বন্দ্বকে দেখার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন, তিনি নিয়মতান্ত্রিকতা (formalism) থেকে উদ্ভূত ভ্রান্তির শিকার হন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে একটা প্রাণহীন জড় মতবাদে পর্যবসিত করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের মধ্যে বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে এই নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের সাধারণ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে ঘোষিত বৈদেশিক নীতিকে বোঝার ক্ষেত্রেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভাবনা, চিন্তা ও বাস্তব আচরণে একই দ্বান্দ্বিকতাবিরোধী নিয়মতান্ত্রিক (formalistic) চিন্তা প্রক্রিয়া দেখা গেছে। সি পি আই দুটোকেই এক ও অভিন্ন মনে করেছে এবং রোবটের মত সোভিয়েট বৈদেশিক নীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে, সি পি এস ইউ যা যা বলছে বা করছে, তাকেই তোতাপাখির মতো বার বার আউড়ে চলেছে। সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হ'ল সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলিকে সংহত করা, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে বিরোধকে আরও বাড়ানো ও তীব্রতর করা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শিবিরের কম মারমুখী শক্তিগুলিকে বৃহৎ আগ্রাসী শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা, বিশ্বশান্তি রক্ষা করা ও তাকে বজায় রাখা এবং এইসবের

দ্বারা বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবের দ্রুত উন্মেষ, বিকাশ ও সাফল্যের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষের বিপ্লব সংগঠিত করা এর লক্ষ্য নয় — তা ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে করতে হবে। সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে যে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং যা আমাদের দেশে বিপ্লবের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, তার সুযোগ গ্রহণ না করা এবং তার পরিবর্তে রোবটের মত কাজ করা ও সোভিয়েট নেতারা যা বলছেন বা করছেন তোতাপাখির মতো তা আউড়ানো প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপদ্ধতি, চিন্তাপ্রক্রিয়া ও আন্দোলনের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হতে পারে না।

সাংগঠনিক নীতির ক্ষেত্রেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার অ-শ্রমিকশ্রেণী চরিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হ'ল পার্টি সংগঠনের লেনিনীয় নীতি। এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বিষয়টি কী? লেনিন বলেছেন ঃ এ হ'ল কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ। অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সর্বহারা গণতন্ত্র সারবত্তাহীন অনুষ্ঠানসর্বস্ব (formal) গণতন্ত্র নয়। সর্বহারা গণতন্ত্র সর্বহারা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত; সেখানে ফর্মাল গণতন্ত্র হ'ল বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন। সুতরাং সবচেয়ে নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পার্টির সংবিধানও দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা আনতে পারে না। এটা প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে আদর্শ ও মতামতের মধ্যে সংগ্রাম সুনিশ্চিত করার জন্য দলের সদস্যদের প্রয়োজনীয় আদর্শগত চেতনার মানের উপর অর্থাৎ কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবেই পার্টি বডির মধ্যে 'কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচনা' করতে পারার মান অর্জনের উপর এবং দলের সদস্যদের সচেতন সর্বহারা বিপ্লবী ভূমিকার উপর। প্রয়োজনীয় আদর্শগত চেতনার মান ছাড়া বাস্তবে পার্টি জীবনে আদর্শ ও মতামতের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ হয়ে যায় এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বাস্তবে অনুষ্ঠানসর্বস্ব গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে কেন্দ্রিকতার চর্চায় গিয়ে দাঁড়ায় ও এই পথে চলতে চলতে পার্টি শীর্ষে, নীচের স্তরের কর্মী-সমর্থকদের থেকে, র‍্যাঙ্ক অ্যান্ডফাইল থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যুরোক্রেটিক অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের জন্ম দেয় এবং দ্বান্দ্বিক চিন্তা প্রক্রিয়ার পরিবর্তে যান্ত্রিক চিন্তা প্রক্রিয়া ও একদিকে নেতৃত্বমণ্ডলী এবং অন্যদিকে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বদলে যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই অবস্থায় শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব না থাকলে, পার্টিবডির মধ্যে গোষ্ঠী ও দলাদলি জন্ম নেয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া করে ও আপসের মাধ্যমে দলের ঐক্য রক্ষা করা হয়, দলের নেতৃত্ব কাজ করে। এভাবে গড়ে ওঠা নেতৃত্ব এবং তার কাজ করাটা যে যৌথ নেতৃত্ব ও পার্টি সংগঠন সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত — একথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের আদর্শগত চেতনার অকল্পনীয় নিচু মান — যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দলের অন্তহীন ভুলের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে, তা-ই পার্টির মধ্যে এই ধরনের মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি নিয়ে এসেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এখন নানা গোষ্ঠী ও দলাদলি আছে। পার্টিবডিগুলি এখন 'ঠিক জায়গায় ঠিক লোক' এই নীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় না, পার্টিবডি গঠিত হয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আপস ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। কে না জানে যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এখন ডাঙ্গের[১১] দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, রণদিভের[১২] বামপন্থী গোষ্ঠী ও প্রয়াত অজয় ঘোষের[১৩] মধ্যপন্থী গোষ্ঠী, যা এখন নাম্বুদিরিপাদের[১৪] নেতৃত্বে রয়েছে — এভাবে বিভক্ত? তাই এই উপদলগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে পার্টিবডিগুলি গঠিত হচ্ছে। এ এখন আর কারুর জানতে বাকি নেই। এর ফলে একদিকে রয়েছে আমলাতান্ত্রিকতা ও সদস্যদের অন্ধ আনুগত্য ও দলীয় উন্মাদনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যান্ত্রিক শৃঙ্খলা; অন্যদিকে দলাদলি। এবং তা সত্ত্বেও নাকি এটি একটি কমিউনিস্ট পার্টি! পার্টি সংগঠনের লেনিনীয় নীতি সম্পর্কে স্ট্যালিন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "কিন্তু এটা থেকে বোঝা যায় যে দলের ঐক্য অথবা দলের লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলারক্ষার সাথে দলাদলির অস্তিত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, উপদলের অস্তিত্ব থেকে দেখা দেয় বহু সংখ্যক কেন্দ্রের অস্তিত্ব এবং একাধিক কেন্দ্রের অস্তিত্ব মানেই হ'ল দলের মধ্যে একটি সাধারণ কেন্দ্রের অভাব, অভীপ্সার ঐক্যে ভাঙন, শৃঙ্খলা দুর্বল ও বিভাজিত হয়ে পড়া, সর্বহারা একনায়কত্বের দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়া। অবশ্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলগুলি, যারা সর্বহারার একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং যাদের সর্বহারাদের ক্ষমতা দখল করতে দেওয়ার ইচ্ছা নেই, তারা উদারনীতির নামে এই ধরনের দলাদলি জন্ম দেওয়ার স্বাধীনতা দিতে পারে, কারণ তাদের লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দলগুলি, যারা

সর্বহারা একনায়কত্বকে অর্জন ও সংহত করার কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে সংগ্রাম করে তারা 'উদার' হওয়া বা দলাদলি করার স্বাধীনতা অনুমোদন করতে পারে না।" (লেনিনবাদের সমস্যা)। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উদার হওয়া ও দলাদলি করার অনুমোদন দিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলগুলির মতো তার পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক চরিত্রকেই প্রমাণ করেছে। স্ট্যালিন আরও বলেছেন, "এর অর্থ হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি সর্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামের অযোগ্য। শ্রমিকদের ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সর্বহারার এমন জঙ্গি দলও তারা নয়, বরং তারা হ'ল সংসদীয় নির্বাচন ও সংসদীয় সংগ্রামের সাথে খাপ খাইয়ে গড়ে ওঠা নির্বাচনী যন্ত্র। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই রকম অবস্থায় ও এই রকম পার্টিকে নেতৃত্বে রেখে বিপ্লবের জন্য সর্বহারাদের প্রস্তুত করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।" (ঐ) কিন্তু বিপ্লব ছাড়া, বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা ছাড়া, আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায় ও অন্যান্য শোষিত সম্প্রদায়ের জনগণের সাথে মিত্রতা গড়ে তুলে সর্বহারাদের ক্ষমতা দখল করা ছাড়া জনগণের সত্যিকারের মুক্তি অর্জন করার আর কোন পথ নেই। এবং এর জন্য চাই একটা সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি।

একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলুন

অতএব, আমাদের দেশের মেহনতি মানুষকে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা কোন্ পথ গ্রহণ করবেন, তাঁরা কি তাঁদের নিজেদেরকে সংসদীয় পথে বয়ে যেতে দেবেন এবং অসহায়ভাবে ফ্যাসিবাদের প্রবল জোয়ারে ভেসে যাবেন, নাকি ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার প্রস্তুতি নেবেন। তাঁদেরকে এ দু'টির মধ্যে যে কোনও একটি, হয় এটা, নয় অন্যটা বেছে নিতে হবে। কারণ মাঝামাঝি কোন পথ নেই। ভারতবর্ষের ফ্যাসিবাদের দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশের ঘনায়মান বিপর্যয়ের জোয়ারকে আটকাতে পারে একমাত্র জনগণ এবং তাদের সংগঠিত সংগ্রাম, যে সংগ্রাম গড়ে উঠবে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের থেকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন প্রকৃত দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে। বিপ্লবী তত্ত্বে বলীয়ান ও পার্টি সংগঠনের লেনিনীয় নীতি অনুযায়ী সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিই একমাত্র তাদের এই সংগ্রামকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং সর্বহারাদের ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে পারে। সংসদীয় নির্বাচন ও সংসদীয় সংগ্রাম পরিচালনা আয়ত্ত করার ক্ষমতা এবং দক্ষতা যতই থাক না কেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেইরকম দলই নয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির মত এটিও সর্বহারাদের বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা ও ক্ষমতা দখলে অক্ষম একটি পেটিবুর্জোয়া সংসদীয় পার্টি। বর্তমান যে সময়টিতে আমরা বাস করছি, তা হ'ল — "খোলাখুলি শ্রেণীসংঘর্ষের, সর্বহারাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের, সর্বহারা বিপ্লবের এমন এক সময় যখন সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও সর্বহারার ক্ষমতা দখল — এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সরাসরি শক্তিসমূহ সংহত হচ্ছে। এই সময়ে সর্বহারাশ্রেণী নতুন ধরনের কর্তব্যের মুখোমুখি, সেগুলি হ'ল — পার্টির সমস্ত কাজকে নতুনভাবে বিপ্লবী লাইনে সংগঠিত করা, শ্রমিকদের ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের প্রেরণায় শিক্ষিত করা, রিজার্ভ বাহিনী গড়ে তোলা ও সক্রিয় করা, প্রতিবেশী দেশগুলির সর্বহারাশ্রেণীর সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, উপনিবেশ ও নির্ভরশীল (dependent) দেশগুলির মুক্তি সংগ্রামের সাথে সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপন করা ইত্যাদি। সংসদীয় ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ অবস্থায় লালিত পালিত পুরনো সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির দ্বারা এই নতুন কর্তব্যগুলি সম্পাদিত হবে ভাবলে, যে কেউই হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এবং অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মধ্যে গিয়ে পড়বে। তাই প্রয়োজন একটা নতুন পার্টি, একটা জঙ্গি পার্টি, একটা বিপ্লবী পার্টি, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সাহসী একটি পার্টি। এরকম একটি পার্টি ছাড়া সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবা অর্থহীন" (ঐ)। স্ট্যালিন যখন একথা লিখেছেন তার তুলনায় এখনকার অবস্থা দশগুণ বেশি জটিল, ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বহারাশ্রেণীর এখন আরও বেশি জঙ্গি সংগঠন প্রয়োজন। আমাদের জনগণের তাই প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পার্টি, সর্বহারাশ্রেণীর জঙ্গি পার্টি। সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া হচ্ছে সেই পার্টি। যদিও দলটি ছোট, তবু এই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পার্টির সমস্ত রকমের বৈশিষ্ট্য এই দলটি পূরণ করেছে। একটি কার্যকরী পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য একে সাহায্য করুন। এটাই হ'ল বর্তমান সময়ের আহ্বান।

১ ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকট প্রসঙ্গে

২ ডাচদের অধীনস্থ নিউ গিনি

৩ একটি রক্ষণশীল পার্টি, বর্তমানে যার অস্তিত্ব নেই।

৪ হিন্দু মৌলবাদী পার্টি, বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি যার থেকে জন্ম নিয়েছে।

৫ সিন্ডিক্যালিস্টরা ছিল কারখানাকে ও উৎপাদনের উপায়সমূহকে শ্রমিকদের হাতে দেওয়ার আন্দোলনের সমর্থক।

৬ পরে শোধনবাদীতে পরিণত।

৭ বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাবিদ পি. সি. মহলানবীশের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি।

৮ ১৯৫৭ সালে সি পি আই কেরলে সরকার গঠন করেছিল।

৯ ভারতবর্ষের অগ্রণী শিল্প মালিক।

১০ ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসি লুঠেরা

১১ প্রয়াত এস এ ডাঙ্গে — একসময় অবিভক্ত সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক, পরবর্তীকালে এ আই সি পি নামে একটি দল গঠন করেন।

১২ প্রয়াত বি টি রণদিভে — অবিভক্ত সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক (৪০-এর দশকের শেষের দিকে); পরে তাত্ত্বিক এবং সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরোর সদস্য।

১৩ প্রয়াত অজয় ঘোষ — ৫০'এর দশকে সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক

১৪ প্রয়াত ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ — সি পি আই (এম)-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পরবর্তীসময়ে পলিটব্যুরোর সদস্য।

১৯৬২ সালের জুন মাসে
এস ইউ সি আই-এর তৎকালীন ইংরেজি মুখপত্র
'সোস্যালিস্ট ইউনিটি'তে প্রথম প্রকাশিত।